প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- **আধ্যাত্মিকতা অভিমুখে যাত্রার পদ্ধতি**
  মোহাম্মাদ আলী সোমালী
- **তাওহীদ, শির্‌ক ও ইবাদতের তাৎপর্য**
  আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী
- **পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাওয়াস্‌সুল**
  এ কে এম আনোয়ারুল কবীর
- **ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ও মূর্তিপূজক আবু শাকির**
- **বিবাহ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও মোহরানা**
  আয়াতুল্লাহ ইবরাহীম আমিনী
- **ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা**
  আয়াতুল্লাহ ইবরাহীম আমিনী
- **হযরত ফাতিমা (আ.)-এর জীবন যাপন পদ্ধতি ও নেদারল্যান্ডের নারী**
  সারা পান্তর
- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহবী**
  মুহাম্মাদ আলী চানারানী

বর্ষ ৭, সংখ্যা ১-২, এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০১৭

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৭, সংখ্যা ১-২

এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৭

সম্পাদক : **এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : কার্তিক - চৈত্র ১৪২৩

যিলহজ ১৪৩৭ - জমাদিউস সানি ১৪৩৮

মূল্য : ১০০ (একশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : বাড়ি # বি-২, ফ্ল্যাট # ৫০২,

মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৯১২১৪৫৯৬৫

Prottasha (Vol. 7, No. 1-2, April-September 2017), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman;

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

  পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা : এক সর্বজনীন দায়িত্ব **৭**

- **নীতি-নৈতিকতা**

  আধ্যাত্মিকতা অভিমুখে যাত্রার পদ্ধতি **১৩**

  মোহাম্মাদ আলী সোমালী

- **ধর্ম ও দর্শন**

  তাওহীদ, শির্ক ও ইবাদতের তাৎপর্য **২১**

  আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী

  পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাওয়াস্‌সুল **৪৬**

  এ কে এম আনোয়ারুল কবীর

  ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ও মূর্তিপূজক আবু শাকির **৭৬**

  সংকলন : সরকার ওয়াসি আহম্মেদ

  বিবাহ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও মোহরানা **৯১**

  আয়াতুল্লাহ ইবরাহীম আমিনী

  ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা **১১৩**

  আবুল কাসেম

- **বিশেষ নিবন্ধ**

  হযরত ফাতিমা (আ.)-এর জীবন যাপন পদ্ধতি ও নেদারল্যান্ডের নারী **১৩৭**

  সারা পান্তর

- **জীবনী**

  রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী **১৪৫**

  মুহাম্মাদ আলী চানারানী

Prottasha
A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 7, No. 1-2, April-September 2017

Table of Contents

- **Editorial**
  Tightening the Bondage in Family- A Great Responsibility **7**
- **Ethics**
  Methodology towards Spirituality **13**
  Dr. Mohammad Ali Shomali
- **Theology and Philosophy**
  Significance of Tawhid, Shirk & Ibadat **21**
  Ayatollah Jafar Sobhani
  Tawassul- In the Viewpoint of Quran & Hadith **46**
  A.K.M. Anwarul Kabir
  Imam Jafar Sadiq (A.) & Abu Shakir **76**
  Compilation: Sarker Wasi Ahmed
  Marriage & Mahr **91**
  Ayatollah Ibrahim Amini
  Role of Men and Women in Islamic Family **113**
  Abul Kasem
- **Special Article**
  Hazrat Fatima's Lifestyle and the Women of Netherlands **137**
  Sara Pastoor
- **Biography**
  Some Sincere Young Companions of Prophet (Sm.) **145**
  Muhammad Ali Chanarani

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	১২০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :
মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-বি-২ ফ্লাট-৫০২, মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা : এক সর্বজনীন দায়িত্ব

সম্পাদকীয়

পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা এক সর্বজনীন দায়িত্ব

পরিবার হল সমাজের মানুষের বিকাশের স্থান। যে মতবাদ ও চিন্তাধারা যতটা পরিবারকে মূল্যবান জ্ঞান করে ততটা এর বন্ধনকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করা এবং এ সামাজিক প্রতিষ্ঠানটিকে নিরাপদ ও এর সদস্যদের মনে প্রশান্তি বজায় রাখার প্রয়াস চালায়। ইসলাম মানুষের সহজাত প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল চিন্তাধারা হিসাবে পরিবারকে অপরিসীম গুরুত্ব দান করেছে এবং এর সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষায় উপযুক্ত ও কার্যকর নীতি ও বিধান প্রণয়ন করেছে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা ও যে বাস্তবতার মধ্যে আমরা অবস্থান করছি তা থেকে এ বিষয়টি আঁচ করা যায় যে, পরিবার প্রতিষ্ঠানটি এ সময়ে বিভিন্নরূপ সমস্যার মুখোমুখি ও অনেকদিক থেকে হুমকির সম্মুখীন। স্বাধীনতার নামে বাধনহীনতা ও অনৈতিকতার প্রসার পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল ও অস্থিতিশীল করে তুলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন, এর অপব্যবহার এবং আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের কৃত্রিম ও অপসংস্কৃতিকে মেনে নেয়া, ইসলামি পারিবারিক নীতিমালা ও শিক্ষার সাথে অপরিচিতি ইত্যাদি এ অবস্থাকে আরো নাজুক করেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের হেদায়াতের নির্দেশনাবাহী সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষ ঐশী আত্মার অধিকারী (সূরা হিজর : ২৯ ও সূরা ছদ : ৭২) হিসাবে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যার মধ্যে অসংখ্য সুপ্ত যোগ্যতা ও সম্ভাবনাময় সৃষ্টিশীলতার গুণাবলি বিদ্যমান (দাহ্‌র : ২) এবং সে একমাত্র সৃষ্টি যার মধ্যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার স্রষ্টার সাক্ষাৎ লাভের উপযোগিতা রয়েছে (ইনশিক্বাক : ৬)। মানুষের মধ্যে যেমন অন্যান্য প্রাণীর মত জৈবিক বৈশিষ্ট্য ও পাশবিক প্রবৃত্তি রয়েছে তেমনি রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক। তাই সে প্রবৃত্তি ও জৈবিক প্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠে বিস্ময়কর অনেক কিছু করতে পারে। এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উৎস হল তার আত্মা, যাকে আল্লাহ সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন (বাকারাহ : ৩১)। যার ফলে সে সকল কিছুর অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে উদ্ঘাটনে সক্ষম। এ আত্মাকেই সকল ভাল ও মন্দ এবং সুন্দর ও অসুন্দর কর্ম ও বিষয়কে বিবেচনা করার শক্তি দেয়া হয়েছে (শাম্‌স : ৯-১০)। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই সে অন্য সব সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী– যাকে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ নিজেকে সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা হওয়ার দাবি করেছেন (মুমিনুন : ১৪)। আল্লাহ এ সৃষ্টিকে অধিকাংশ জীব ও প্রাণীর ন্যায় জোড় হিসাবে অর্থাৎ দুই লিঙ্গের করে (পুরুষ ও নারী হিসাবে) বিভক্ত করেছেন। তারা একে অপরের সান্নিধ্যে প্রশান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে থাকে

(আ'রাফ : ১৮৯ ও রূম : ২১)। আর অপরের অনুপস্থিতিতে জীবনকে অনর্থক মনে করে এবং হৃদয়ে শূন্যতা ও অপূর্ণতা বোধ করে। বিশেষত পৃথিবীর ঝড়ঝঞ্ঝাময় ও সমস্যাসংকুল পরিবেশে তারা একাকী অসহায়ত্ব বোধ করে। সুতরাং পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ দুয়ের সম্পর্ক জৈবিকতার ঊর্ধ্বে নিহিত যা তাদের মানবিক অনুভূতি ও আত্মিক চাহিদা থেকে উৎসারিত। একারণেই আল্লাহ অন্যান্য প্রাণীর নর ও মাদীর মধ্যে যে জৈবিক আকর্ষণ রয়েছে তাকে ঐশী নিদর্শন বলে অভিহিত করেন নি, কিন্তু মানবজাতিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যকার সম্পর্ককে তাঁর অন্যতম নিদর্শন বলেছেন (রূম : ২১) এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে নর ও মাদী থাকার মূল উদ্দেশ্য শুধু বংশবৃদ্ধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী থাকার দর্শন শুধু বংশবৃদ্ধি নয়; বরং প্রশান্তি লাভ ও ভালোবাসা বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন মানুষের জৈবিক চাহিদা ও প্রয়োজনকে অপরিহার্য প্রয়োজন গণ্য করলেও একে মানবিক প্রকৃতির রূপদান করেছে এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রচলিত রীতিকে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্ঞান করে নি। শরীয়তের রীতি ও কাঠামোতে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ককে নির্দিষ্ট এক ধারায় প্রবাহিত করেছে যা 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের রূপে প্রকাশিত হয়। ইসলাম পরিবার ও সমাজের মানুষের মধ্যে পশুসুলভ প্রবণতা রোধ এবং লজ্জা ও পবিত্রতা রক্ষার তাগিদে বিবাহের ক্ষেত্রে সীমানির্ধারক বিশেষ কিছু নীতি প্রণয়ন করেছে।

কেননা, মানুষের মধ্যে অন্য প্রাণী থেকে ভিন্ন 'লজ্জা' নামক যে অনন্য প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা রক্ষা করে না চললে তার সাথে পশুর কোন পার্থক্য থাকবে না। এজন্য ইসলাম কেবল বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক ও ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ন হয় নি; বরং মাহরাম বলে ঘোষিত বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহকে হারাম বলে গণ্য করেছে (নিসা : ২৩)। কারণ, নিকট সম্পর্কিত এ ব্যক্তিরা যেহেতু সার্বক্ষণিক সংশ্লিষ্টতায় থাকে সেহেতু এ গণ্ডিতে যৌন সম্পর্কের চিন্তার অনুপ্রবেশ তাদেরকে ফিতরাতগত লজ্জার বৈশিষ্ট্য ও খোদামুখি ঐশী প্রবণতা থেকে দূরে সরিয়ে পশুপ্রবৃত্তির দিকে পরিচালিত করবে। পিতা-মাতা, ভাইবোন, মামা-চাচা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা-ফুফু এবং এরূপ অতি নিকট সম্পর্কের ব্যক্তিরা পাশবিক চিন্তার ঊর্ধ্বে অভিন্ন আন্তরিক পরিবেশে একত্রে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নরূপ সম্পর্কের ধারণা জন্মায় না। তদুপরি ইসলাম বিকৃত কোন ধারণা সৃষ্টির পথকে বন্ধ করতে বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে এধরনের চিন্তার মৃত্যু ঘটানোকে আবশ্যক করেছে। এভাবে ইসলাম মানবোপযোগী পবিত্র এক পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

লজ্জা ও শালীনতা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত বিষয়। তবে এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে ধরনের পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে নারী কামনা করে পুরুষ তার সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করবে ও উভয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এক সম্পর্ক থাকবে। তাই নারীর নিকট পুরুষের সঙ্গে হৃদ্যতাহীন শারীরিক সম্পর্ক অনাকাঙ্ক্ষিত ও ঘৃণ্য বিষয়। নারী তার প্রতি নিছক পাশবিক ও আগ্রাসী যৌন দৃষ্টিকে কখনই পছন্দ করে না। এ সম্পর্কে ফ্রান্সের নারী আইনবিদ সিমন ডু বুভার বলেন, 'নারীরা চায় পুরুষরা যেন তাদেরকেই কামনা করে, তাদের দেহকে নয়। তাই যদি কোন পুরুষ কোন

নারীর সামনে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে তবে সে নির্যাতিত হচ্ছে বলে অনুভব করে। এরূপ প্রশংসা তার নিকট অপমানের বিষয় বলে গণ্য। তাই যদি সে লক্ষ্য করে যে, কোন পুরুষ তার দিকে ঐরূপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে প্রকৃতিগতভাবেই নিজেকে ঢাকতে শুরু করে। এ থেকেই নারীর লজ্জার সহজাত প্রকৃতির বিষয়টি প্রমাণিত হয়।' (সেকেণ্ড জেন্ডার, পৃ. ৫৬)

এ কারণেই নারীর দেহের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি তার মনে একদিকে লজ্জা অন্যদিকে ভীতির সৃষ্টি করে। কারণ, তার কল্পনায় ধর্ষিত হওয়ার দৃশ্য চিত্রায়িত হয়।

পাশ্চাত্যের অপর এক নারী চিন্তাবিদ পামেলা অ্যাবোট বলেছেন, 'নারীর মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের মধ্যে পুরুষের কল্পনায় যৌন কামনা পূরণের হাতিয়ার হওয়ার উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করে। প্রথমত, নারীর মধ্যে যৌন প্রবণতা এতটা প্রাধান্য রাখে না যে, কোন পুরুষকে দেখামাত্রই তার যৌন চাহিদা পূরণের চিন্তা মাথায় আসবে; দ্বিতীয়ত, নারীর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে হোক বা ঐশীভাবে, পবিত্রতা রক্ষা এবং অশালীন কর্ম ও আচরণ থেকে দূরে থাকার গুণ রয়েছে আর এটি সংরক্ষণের বিষয়টি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। এ দু'টি বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে যৌন নিপীড়ন থেকে রক্ষার ঢাল হিসাবে শালীন পোশাক পরিধানে উদ্বুদ্ধ করে।' (ওম্যান সোশিওলজি, পৃ. ২৩৪)

নারীর এ মানসিক দিকটি বিবেচনা করেই ইসলাম নারীদের জন্য পর্দার বিধান প্রণয়ন করেছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, পর্দা যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন এবং লাঞ্ছিত হওয়ার উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করে। কেননা, এটি নারীর লজ্জার অধিকারী ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে। সাধারণত যেসব নারী ও পুরুষ শালীনতা ও লজ্জা বজায় রেখে চলে তাদের মধ্যে বিয়ের বিষয়ে অধিক আগ্রহ ও বৈবাহিক জীবনে প্রশান্তি লাভের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তারা বিয়ের পর যেন এক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির অনুভূতি লাভ করে যা তাদেরকে মানসিক শান্তি দান করে। তারা উৎসাহ ও ভালোবাসার সাথে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নতুন অভিজ্ঞতার সৌন্দর্যকে অনুপম প্রাপ্তি বলে অনুভব করে।

বর্তমান সমাজে যেভাবে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকে সুন্দর ও আধুনিকতার প্রতীক হিসাবে মূল্যবোধের রূপ দেয়া হচ্ছে এবং ধর্মীয় বিধি ও দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ও পশুচিত অবৈধ যৌনাচারকে স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতস্থ করা হচ্ছে তা পরিবার ব্যবস্থার প্রতি এক সুপরিকল্পিত বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণ ছাড়া কিছু নয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে নগ্নতাকে শৈল্পিকতা এবং লজ্জা ও পর্দাকে পশ্চাদপদতা গণ্য করা, বৈধ ও জারজ সন্তানের মধ্যে পার্থক্য না করা, সমকামী জুটিদেরকে পরিবারের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা, পতিতাবৃত্তিকে বৈধ পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া, ছেলে-মেয়েদের বিপরীত লিঙ্গ থেকে বন্ধু গ্রহণকে সংস্কৃতির রূপ দেয়া, ভ্রূণহত্যাকে অপরাধ গণ্য না করা এবং নারীর গৃহকর্ম, মাতৃত্ব ও সন্তান প্রতিপালনকে দাসত্বমূলক ও মূল্যহীন কর্ম বিবেচনা করা হচ্ছে। (দ্রষ্টব্য সিডা বা সি.ই.ডি.এ.ডব্লিউ নীতিমালা) বাস্তবে আন্তর্জাতিক অপশক্তি পরিবারের বিনাশ সাধনকে তাদের প্রধান টার্গেট নির্ধারণ করেছে। প্রশ্ন হল, কেন তারা ধর্মীয় পারিবারিক নীতিমালা, পর্দা ও শালীনতাকে তাদের জন্য হুমকি মনে করে। কেন তারা পারিবারিক

বন্ধনকে শক্তিশালীকারী সকল বিধানকে পদদলিত করে এর বিপরীতে একে দুর্বলকারী সংস্কৃতি ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আন্তর্জাতিক অপশক্তির কাছে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম ও অন্যান্য ঐশী ধর্মকে ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল যৌনতার প্রচার-প্রসার ঘটিয়ে লজ্জা নামক ঐশী মানবীয় গুণকে নষ্ট করে পরিবারের ভিত্তিকে ধ্বংস করা। কারণ, তারা জানে যে, যার লজ্জা নেই তার কোন ধর্মের বালাই নেই।

যখন ইসলাম পরিবারে সন্তানের প্রশিক্ষক হিসাবে নারীর ওপর দায়িত্ব দিয়েছে সন্তানকে শিক্ষিত, ত্যাগী, সাহসী, আত্মসংযমী, উদ্যোগী, খোদাবিশ্বাসী, লজ্জা ও আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলার তখন তারা (পাশ্চাত্য ও তার দোসর) মানবজাতিকে এমন এক মাতা উপহার দিতে চায় যে লজ্জাহীন, ভোগবাদী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যৌনাচারী, স্বার্থপর, ভ্রূণহত্যাকারী, খোদাদ্রোহী, অবিশ্বস্ত ও দায়িত্বহীন। এরূপ মা হতে কখনই সুস্থ চিন্তা, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সন্তান কামনা করা যায় না। আজ যারা নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পণ্যরূপে ব্যবহার করে তাকে মূল্যহীন করেছে তারাই নারীর অধিকার ও মর্যাদার দাবি তোলে। অথচ ইসলাম মাতাকে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রকাশস্থল এক সত্তা বলে বিবেচনা করেছে যার মধ্যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটান; যাকে তিনি মানবশিশুর খাদ্যদানের মাধ্যম করে নিজেরই একটি গুণ অর্থাৎ রিজিকদাতা (রাজ্জাক) হওয়ার গুণে গুণান্বিত করেছেন; যার ওপর তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করে প্রতিপালনকারী হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন। যার পায়ের নিচে তিনি সন্তানের বেহেশত নির্ধারণ করেছেন। ইসলাম নারীকে শিক্ষিত, উন্নত চিন্তা ও বিশ্বাস এবং মানবিক ও নৈতিক গুণের অধিকারী এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু পাশ্চাত্য এখন হযরত মারইয়ামের মত খোদাপ্রেমিক ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন মাতা হওয়াকে গর্বের বলে মনে করে না; বরং যৌন আবেদনময়ী নারীদেরকে মেয়েদের সামনে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করে ধর্মের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে নারীদের বিষয়ে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান : অতিরঞ্জিত আধুনিকতাবাদী, কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথম দল পাশ্চাত্যের অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। দ্বিতীয় দলটি নারীকে বুদ্ধিবিবর্জিত এক সৃষ্টি বিবেচনা করে তাকে শিক্ষাসহ সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তৃতীয় দলটি নারীকে সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য, মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী সত্তা হিসেবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম জ্ঞান করে, তবে পুরুষের সাথে তার আত্মিক ও শারীরিক পার্থক্য থাকার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রগত ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু এ পার্থক্য মানবজাতির প্রত্যেকের মধ্যে যোগ্যতাগত পার্থক্যের মত যা কখনই তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে না। কারণ, মানুষের মূল পর্যাদা তার মনুষ্যত্বের মধ্যে– যেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

নীতি-নৈতিকতা

আধ্যাত্মিকতা অভিমুখে যাত্রার পদ্ধতি

আধ্যাত্মিকতা অভিমুখে যাত্রার পদ্ধতি

মোহাম্মদ আলী সোমালী

এই রচনায় আমরা মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতা চর্চা ও বিশেষ করে নৈতিকতার (আখলাক) বিষয়ে বিদ্যমান চিন্তাগত বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। সাধারণভাবে আমরা পণ্ডিতদের ধারণাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি:

১. দার্শনিক পদ্ধতি
২. রহস্যবাদী পদ্ধতি
৩. শাস্ত্রীয় বা ধর্মগ্রন্থভিত্তিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতি

অনেক মুসলিম পণ্ডিতই কতিপয় গ্রীক দার্শনিকের, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পেয়েছেন যাঁরা ব্যাপক মাত্রায় মানবীয় আত্মা সম্পর্কে কথা বলেছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবাত্মার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি রয়েছে যেগুলো কর্মসমূহের জন্য দায়ী। সেগুলো হলো :

ক. বিবেক-বুদ্ধি : এই শক্তি জ্ঞান অর্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি আমাদেরকে কোন বিষয় বুঝতে সাহায্য করে এবং আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে সক্ষম করে। যদি এই শক্তি যথাযথভাবে কাজ করে, তাহলে কোন ব্যক্তি সত্যিকার প্রজ্ঞা (হিকমাহ) অর্জন করতে পারে। এর অর্থ হলো এটা নয় যে, কাউকে অতিরিক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিয়োজিত হতে হবে, যেহেতু নাস্তিকতা বা সংশয়বাদের অন্যতম কারণ হলো এটি; বরং এর অর্থ হলো আমাদেরকে অবশ্যই ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি যথেষ্ট বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন না হয় তাহলে সে যা শোনে তা-ই গ্রহণ ও বিশ্বাস করতে পারে। এই ধরনের মানুষ খুব সহজেই প্রতারিত হয়ে থাকে। ইবনে

সীনা একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যে বলেন : 'যে ব্যক্তি কারণ ছাড়া কোন যুক্তিকে মেনে নিতে অভ্যস্ত সে মানুষ নয়।' এটি এজন্য যে, মানবের একটি মৌলিক অংশ হলো বিবেক-বুদ্ধি এবং মানুষ দার্শনিকদের দ্বারা প্রায়শই সংজ্ঞায়িত হয় 'বিবেকসম্পন্ন প্রাণী' হিসেবে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত ভারসাম্য রক্ষা করা এবং অতি বিবেকসম্পন্ন ও জটিলতাপূর্ণ অথবা অতিরিক্ত গ্রহণকারী না হওয়া।

২. **ক্রোধ :** ক্রোধের শক্তি হলো সেটা যা আমাদের মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই শক্তি ছাড়া বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য আমাদের কোন অনুপ্রেরণা থাকত না। যদি কেউ এই শক্তিকে চরম মাত্রায় ব্যবহার করে তাহলে তারা আক্রমণাত্মক হয় এবং সবসময় আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ক্রোধের শক্তির ঘাটতি রয়েছে তারা ভীতু প্রকৃতির হয়। এই মতাদর্শের দার্শনিকগণ এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন যাতে আমরা সাহসিকতার গুণ অর্জন করতে পারি। সুতরাং একজন ভালো মানুষ হলো সে-ই যে জানে যে, কখন ক্রোধান্বিত হতে হয় এবং কী পরিমাণে ক্রোধান্বিত হতে হয়।

৩. **কামনা-বাসনা :** কামনা-বাসনার শক্তি হলো সেই শক্তি যা প্রধানত যৌন প্রবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত, তবে তা আমাদের খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়কেও শামিল করে। যদি মানুষের মধ্যে যৌন কামনা না থাকত তাহলে মানব জাতির অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা হুমকির সম্মুখীন হতো। এই শক্তিকেও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আনতে হবে যেখানে মানুষ হবে পবিত্র, শালীন ও বিনয়ী।

সুতরাং, যদি কেউ এ তিনটি শক্তির সবগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে তাহলে সে প্রজ্ঞা, সাহসিকতা এবং পবিত্রতার অধিকারী হবে। এর অর্থ হলো সেই ব্যক্তি হলো ন্যায়পরায়ণ বা 'আদিল', যে তার আত্মার প্রতিটি দিকে পূর্ণতা অর্জন করেছে। 'আদিল' হওয়া কেবল পাপ থেকে থাকা সম্পর্কিত নয়; বরং তা প্রতিটি ক্ষমতার পূর্ণতারও বিষয়।

এই আধ্যাত্মিক মতাদর্শ আত্মগঠনের প্রশ্নে একটি যৌক্তিক বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এটি বিবেকসম্মত বা যুক্তিসংগত, তবে কেউ কেউ মনে করে যে, এটি অধিক মাত্রায় ভাবমূলক এবং এতে উদ্বুদ্ধকরণ ও আবেগগত প্রকৃতির ঘাটতি রয়েছে যা মানুষকে সত্যিকারভাবে পরিবর্তনে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আমাদেরকে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা দেয়া হয়, কিন্তু এটি জানা কঠিন হতে পারে যে, কোন্ পরিস্থিতিতে ভারসাম্য কেমন হবে। এই পদ্ধতি

ফলদায়ক, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়; আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের আত্মগঠনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব ও উদ্বুদ্ধকারী উপাদান যোগ করতে হবে।

রহস্যবাদী পদ্ধতি

রহস্যবাদীরা আত্মগঠনের পুরো প্রক্রিয়াকে আল্লাহর পথে যাত্রা বা পূর্ণতার পথে যাত্রা হিসেবে গণ্য করেন এবং একে পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ব্যাপার বলে গণ্য করেন। পূর্বের পদ্ধতি ও এই পদ্ধতির মধ্যকার পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে আত্মা ও আত্মগঠনের মধ্যে সম্পর্ককে এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরুন, একটি বাড়িকে আপনি সুন্দর করার ইচ্ছা করলেন। এক্ষেত্রে আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। আপনি ময়লা-আবর্জনা বাইরে ফেলে দিতে পারেন, তারপর বাড়ির সাজানোর কাজ করতে পারেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত পথে আসবাবপত্র, পর্দা ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে গৃহসজ্জা করতে পারেন। যদি কেউ ময়লা-আবর্জনা ও সব কদাকার জিনিস সরিয়ে ফেলে এবং একে সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে সাজায় তাহলে বাড়িটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। একইভাবে আমরা যে বাড়িটিকে সজ্জিত করতে চাই সেটাকে আত্মা হিসেবে গণ্য করতে পারি যা আমরা পরিষ্কার করতে চাই এবং উত্তম চরিত্র দিয়ে সজ্জিত করতে চাই। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের অন্তর থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে আল্লাহ তা'আলা তার ভেতর আলো দিতে পারেন এবং আমাদের অন্তরকে উত্তম চরিত্র দিয়ে সজ্জিত করেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি হাদিসে পড়ে থাকি, 'যে ঘরে কুকুর রয়েছে ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করেন না।'[১]

একইভাবে আমরা আমাদের অন্তরের অবস্থাকে বিবেচনা করতে পারি এবং যদি তা কুকুরের মতো আক্রমণাত্মক, বদমেজাজী অথবা রোগাক্রান্ত হয় তাহলে আমরা ফেরেশতাদের প্রবেশের আশা করতে পারি না। সুতরাং এই প্রক্রিয়া তিনটি প্রধান পর্যায়কে শামিল করে :

তাখলিয়া– পরিশুদ্ধকরণ
তাহলিয়া– সজ্জিতকরণ

১. বিহারুল আনওয়ার ৫৬তম খণ্ড, পৃ. ১৭৭

তাযলিয়া– জ্বলজ্বল করতে শুরু করা (যখন আপনি ওপরের দুটি কাজ করেন তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি ঘটতে শুরু করে)

যদিও এই পদ্ধতি একটি পর্যায় পর্যন্ত উদ্বুদ্ধকারী এবং আমাদেরকে আত্মগঠনের একটি পরিকাঠামো দিতে পারে, কিন্তু এটি প্রগতিশীল কোন পদ্ধতি নয়, যেহেতু কোন্ ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার যাত্রা কোথা থেকে সঠিকভাবে শুরু করবে এবং শেষ করবে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে না। কোন্ বিষয়টি আমাদের প্রথমে পরিষ্কার করতে হবে অথবা কী দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করতে হবে সে সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা দেয় না। তারপরও এই পদ্ধতি উপকারী, কিন্তু আত্মগঠনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা হিসেবে এটি যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে আত্মা ও আত্মগঠনকে নিম্নোক্তভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন মানুষ একটি ফুলের মতো এবং একটি ফুল যত্ন ছাড়া জন্মাতে পারে না। একটি ফুল অন্য জিনিসের মতো জন্মাতে পারে, কিন্তু এটি অনন্য কিছু নয়। একটি ফুল পর্যায়ক্রমে জন্মায় যদি সতর্কতার সাথে সবকিছুর যত্ন নেয়া হয়। এটি এর সদৃশ যেভাবে একটি শিশু বড় হয়ে ওঠে। শিশু অবস্থার আগে কেউ কিশোর হতে পারে না। একইভাবে কেউ একজন শিশুর খাদ্য একজন কিশোরকে দিতে পারে না, অথবা এর বিপরীতটা করতে পারে না।

তাই দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ রহস্যবাদী পদ্ধতি আধ্যাত্মিক উন্নতিকে একটি গতিশীল পথ হিসেবে দেখে থাকে যেহেতু এটি একটি যত্নসহকারে পরিকল্পিত প্রক্রিয়া।

কারো সেসব লোকের পথনির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে যারা এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যারা প্রতিটি স্তরে কী করতে হবে সে সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি স্তরকে পৃথকভাবে চিন্তা করতে হবে। এর অর্থ হলো অবশ্যই প্রতিটি স্তরে প্রত্যাশা ভিন্ন ভিন্ন হবে। একটি স্তরে এক ব্যক্তির জন্য যা উত্তম তা উচ্চতর পর্যায়ে আরেক ব্যক্তির জন্য উত্তম নাও হতে পারে। যেমন যদি একজন ছোট শিশু সূরা ফাতিহা মুখস্ত করে এবং তা তেলাওয়াত করে তাহলে মানুষ শিশুটির প্রশংসা করতে পারে এবং অভিভূত হবে, কিন্তু যদি কোন নামাযের ইমাম সেই সূরা একইভাবে তেলাওয়াত করে তাহলে মানুষ তার সমালোচনা করবে এবং তার পেছনে নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। সুতরাং সবকিছুর একটি তুলনার বিষয় আছে যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের থেকে কী আশা করা উচিত। এটি হলো এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে যাওয়ার একটি চলমান সফর।

শাস্ত্রীয় বা ধর্মগ্রন্থভিত্তিক পদ্ধতি

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো কোরআন এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের সুন্নাহর শরণাপন্ন হওয়া। যাঁরা এই পদ্ধতির উপদেশ দেন তাঁরা অনুভব করেন যে, দার্শনিক পরিকাঠামোর কোন প্রয়োজন নেই এবং এর পরিবর্তে তাঁরা কোরআনের ওপর ভিত্তি করে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত গুণাবলির তালিকা তৈরি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা লোভ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতগুলো বের করেন যা প্রকাশ করে যে, লোভ একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দোষ এবং হাদিস থেকে এর প্রমাণ দেন ও সমাধান বের করে।

আমাদের আচরণ কেমন হবে?

এই সকল পণ্ডিত ইসলামি নৈতিক চিন্তায় বিরাট অবদান রেখেছেন। যাহোক, এই পদ্ধতিগুলোর প্রতিটির শক্তিশালী ও দুর্বল দিক রয়েছে এবং যদি আমরা সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এগুলোর মধ্যে একটি সমন্বয় করতে হবে যার মাধ্যমে প্রতিটি মতাদর্শের সুবিধাসমূহ একত্র করা যেতে পারে।

একটি যথাযথ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান

১. আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে যেহেতু কোন্‌টি ভালো ও কোন্‌টি মন্দ সে সম্পর্কে পথনির্দেশনা দেয়ার মতো আল্লাহ ও মহানবী (সা.)-এর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। সকল সত্য আল্লাহ থেকে– তা রহস্যবাদীদের অথবা দার্শনিকদের দ্বারাই আমাদের কাছে পৌঁছানো হোক না কেন।

২. নৈতিক প্রক্রিয়া ব্যাপক হতে হবে। মানবের কোন দিক সেখানে উপেক্ষিত হতে পারবে না। আমরা এমন কোন ব্যক্তি চাই না যে কেবল একটি দিকে উন্নত। একজন মানুষকে অবশ্যই সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকে উন্নতি করতে হবে।

৩. নৈতিক প্রক্রিয়া বিবেকসম্মত হতে হবে এবং যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, আর এটি অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও কর্মপোযোগী হতে হবে।

৪. পরিকাঠামো অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং কোন বৈপরীত্য থাকতে পারবে না।

৫. যেহেতু আত্মগঠন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং স্থরিব কোন বিষয় নয়, তাই নৈতিক প্রক্রিয়া অবশ্যই আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও পরিস্থিতিতে কী করতে হতে তার শিক্ষা দেবে। অধ্যয়ন ও অনুশীলনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে একজন মানুষ বলতে পারে যে, তার পরামর্শ বা উপদেশের কোন প্রয়োজন নেই।

৬. ইসলাম এমন এক ধর্ম যা যুক্তি-বুদ্ধিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। ইসলামে যুক্তিহীন কিছু নেই। অনেক কিছুই ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এটি এ কারণে নয় যে, সেগুলো যুক্তির বিরোধী; বরং সেগুলো যুক্তির ঊর্ধ্বে। কোন কিছু যুক্তির বিরোধী হওয়া ও যুক্তির ঊর্ধ্বে হওয়ার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য একটি উদাহরণকে বিবেচনা করে থাকি। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পাশের রুমে কতজন লোক রয়েছে, তাহলে সে কেবল তার যুক্তি ব্যবহার করে আপনাকে বলতে পারবে না। এই উত্তর যুক্তির মাধ্যমে আসে না। অন্যদিকে যদি কেউ উত্তর দেয় যে, পাশের রুমে এক মিলিয়ন লোক রয়েছে, তাহলে সেই রুমের পরিমাপ জানা থাকার কারণে আমরা বলতে পারি যে, এই উত্তর যুক্তির বিরোধী।

উপসংহার

কোরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে আমাদের একটি নৈতিক পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন যেখানে একই সময়ে যুক্তিসংগত ও দার্শনিক ক্ষেত্রও রয়েছে। এই পদ্ধতির স্পষ্ট অগ্রাধিকারও রয়েছে এবং যদি দুটি বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে এই পদ্ধতি কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা প্রদর্শন করবে। সবশেষে আমরা অবশ্যই খুঁজে বের করতে সক্ষম হব যে, প্রতিটি পর্যায়ে আমরা কী আশা করতে পারি, সাধারণভাবে তাদের দ্বারা যারা আমরা যে পর্যায়ে রয়েছি তা অতিক্রম করে গেছে। যেহেতু তাদের উপদেশ, পরামর্শ ও সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমসাময়িক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে আধ্যাত্মিকতার শিক্ষক ছিলেন যাঁরা এই সব মতাদর্শকে সমন্বিত করেছিলেন এবং যাঁদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যেমন ইমাম খোমেইনী, আল্লামা তাবাতাবেয়ী, আয়াতুল্লাহ মোতাহ্হারী এবং আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমোলী।

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

ধর্ম ও দর্শন

তাওহীদ, শির্ক ও ইবাদতের তাৎপর্য

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাওয়াস্‌সুল

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ও মূর্তিপূজক আবু শাকির

বিবাহ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও মোহরানা

ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা

তাওহীদ, শির্ক ও ইবাদতের তাৎপর্য

আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী

পবিত্র কোরআনের সবচেয়ে মৌলিক আলোচনার বিষয় হল তাওহীদ ও শির্ক। আলেম ও মনীষীরা তাওহীদ ও শির্ককে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। সাধারণত আকীদা ও কালামশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে তাওহীদের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে লেখকরা আবশ্যিকভাবে শির্কের শ্রেণিবিভাগও করেছেন। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদ ও শির্কের বিভিন্ন প্রকার ও সংজ্ঞা তুলে ধরে মূল (ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শির্কের) আলোচনায় প্রবেশ করব।

যেহেতু সাধারণত ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের কোন সঠিক ও যৌক্তিক সংজ্ঞা দেয়া হয় না, সেহেতু কোন্ কর্ম ও আচরণ শির্কের অন্তর্ভুক্ত ও কোন্‌টি নয় তা নির্ণয়ে ভুলের শিকার হতে হয়। অর্থাৎ যদি ইবাদতের সঠিক সংজ্ঞা না দেয়া হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বৈধ কর্ম ও আচরণও ভুলক্রমে শির্ক বলে গণ্য এবং অনেক অবৈধ কর্ম ও আচরণ তাওহীদের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, একদল বলবে নবি, আল্লাহর ওলি ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া ও কোন কিছু চেয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া স্পষ্ট শির্ক। কারণ, এটা আল্লাহর ইবাদতের শামিল। আরেকদল বলবে, না, এটা শির্ক নয়; বরং তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাঁরা এক্ষেত্রে মাধ্যম মাত্র– যাঁদের কোন স্বকীয়তা নেই; বরং আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে তাঁদের এরূপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ফেরেশতাদের মত তাঁরাও আল্লাহর অধীন বান্দা হিসেবে সৃষ্টিজগতে ভূমিকা রাখেন। তাই কখনই তা শির্ক নয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে কোন্ কাজটি শির্ক ও কোন্ কাজটি শির্ক নয় তা যাচাইয়ের জন্য সর্বপ্রথম তাওহীদ ও শির্কের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদের আটটি প্রধান প্রকার রয়েছে। যথা: সত্তাগত তাওহীদ, গুণগত তাওহীদ, সৃষ্টিগত তাওহীদ, প্রভুত্বগত তাওহীদ, (শাসন ও) কর্তৃত্বগত তাওহীদ, আনুগত্যগত তাওহীদ, বিধানগত তাওহীদ ও ইবাদতগত তাওহীদ।

১. সত্তাগত তাওহীদ হল আল্লাহকে একক, অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য অনিবার্য সত্তা বলে বিশ্বাস।[১]

২. গুণগত তাওহীদ হল মহান আল্লাহর হ্যাঁ-বাচক (ইতিবাচক) গুণাবলি ও তাঁর সত্তা একই এ অর্থে যে তাঁর মহাজ্ঞানী, পরম শক্তিমান ও চিরঞ্জীব হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর সত্তাবহির্ভূত নয়। তাঁর সত্তা হল সকল পূর্ণতার গুণের একীভূত এক সমন্বয়। ইমামী ও মুতাযিলা চিন্তাধারার অনুসারীরা এরূপ মত পোষণ করে থাকে। কিন্তু আশআরী চিন্তাধারার অনুসারীরা তা আল্লাহর সত্তাবহির্ভূত মনে করে।

৩. সৃষ্টিগত তাওহীদ হল সৃষ্টিজগতে একমাত্র স্বাধীন ও প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ।[২] তিনি ব্যতীত ফেরেশতামণ্ডলী, মানুষসহ অন্যান্য সকল সৃষ্টি ও বস্তুগত কারণের মধ্যে যে সৃজনক্ষমতা রয়েছে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটি কেবল পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি যথার্থ ও নিখুঁত দৃষ্টিদানের পর অর্জিত হয়। সৃষ্টিগত তাওহীদের বিষয়ে ইসলামের কোন কোন চিন্তাধারার উপস্থাপিত ভুল ব্যাখ্যার কারণে ধর্মহীন ও ধর্মবিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে সৃষ্টিজগতে বস্তুগত ও অবস্তুগত কারণগুলোর ভূমিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, তারা মনে

---

১. সূরা ইখলাসে সত্তাগত তাওহীদ পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। সূরাটির আয়াতগুলোর অর্থ হল : (১) বল, 'তিনি আল্লাহ, অদ্বৈত, (২) আল্লাহ সদা কাঙ্ক্ষিত (ও অনন্যপর সত্তা); (৩) তিনি জন্মদান করেন নি এবং জন্মগ্রহণ করেন নি। (৪) এবং তাঁর কোন সমতুল্য ও সমকক্ষ নেই।– অনুবাদক

২. যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ– সেই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই; তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। (সূরা আনআম : ১০২) অন্যত্র বলা হয়েছে: قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ– তুমি বলে দাও, 'আল্লাহ-ই সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি অদ্বিতীয়, মহাপ্রতাপশালী। (সূরা রা'দ : ১৬)– অনুবাদক

করে মহান আল্লাহ কোন বস্তু বা অবস্তুগত উপকরণের মাধ্যম ও ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি সৃষ্টিজগতের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তাই আল্লাহ সৃষ্টিজগতে কোন বস্তুকেই প্রভাব রাখার বৈশিষ্ট্য দান করেন নি। তাদের মধ্যে দৃশ্যমান প্রভাব কার্য ও কারণের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে উৎসারিত নয়; বরং যে কোন কারণ থেকে যে কোন কার্য প্রকাশিত হতে পারে।

এধরনের ব্যাখ্যা কার্যকারণের সূত্রকে অস্বীকারে পর্যবসিত হয়। ফলে আল্লাহ প্রকৃতিজগতে সকল কারণের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হন। যেমন রোগ-বালাইয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ স্বয়ং রোগ সৃষ্টি করেন, এক্ষেত্রে জীবাণুর কোন মধ্যস্থ ভূমিকা নেই। বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে সূর্য, বায়ু ও মেঘের মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহের কোন কার্যকারিতা নেই; বরং এ মাধ্যমগুলোর ভূমিকা ছাড়াই আল্লাহ বৃষ্টিদান করেন। অথচ এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা।

৪. প্রভুত্বগত তাওহীদ হল সৃষ্টিজগতের মালিক ও প্রতিপালক হিসেবে মহান আল্লাহর একত্ব। আরবিতে রব (ربّ) শব্দটির অর্থ হল প্রভু বা মালিক। যেমন বলা হয় ربّالبيت বা গৃহের মালিক, ربّ الدابة ev cïi gvwjK, ربّ الضيعةev ক্ষেতের মালিক।[১] যেহেতু যে কোন বস্তুর প্রতিপালন, তত্ত্বাবধান ও

১. পবিত্র কোরআনেও মহান আল্লাহ হযরত ইউসূফ (আ.)-এর ভাষায় মিশরের সম্রাটকে তার দাসের 'রব' বলে সম্বোধন করে ঐ দাসকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : وَ قَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اُذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ এবং তাদের মধ্যে যার মুক্তির ব্যাপারে সে (ইউসূফ) জানত তাকে বলল, 'তোমার রবের নিকট আমার কথা স্মরণ কর।' (সূরা ইউসূফ : ৪২) তবে মনে রাখা আবশ্যক যে, সৃষ্টিজগতে কোন বস্তু বা সম্পদের ওপর মানুষের মালিকানা একটি প্রণীত বিধান বা চুক্তিভিত্তিক (আইনগত) বিষয় যা হস্তান্তরিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। যেমন- ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে আইনগতভাবে এ মালিকানার রদবদল হয় ও মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে এ ধরনের মালিকানার অবসান ঘটে বা তার উত্তরাধিকারীদের কাছে তা স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর মালিকানার প্রকৃতি এরূপ নয়। বরং তাঁর ক্ষেত্রে মালিকানার বিষয়টি সত্তাগত। কারণ, তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা হিসেবে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর ওপর নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন মালিকানার অধিকারী। সৃষ্টিও সত্তাগতভাবে তার অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতার জন্য সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কখনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না। তাই তিনি প্রকৃত অর্থেই সকল কিছুর মালিকানার অধিকারী– যা কখনই হস্তান্তরযোগ্য নয়। তাঁর মালিকানা অবিনশ্বর। সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুর ওপর মহান আল্লাহর এ অবিনশ্বর মালিকানা ও প্রভুত্বের ঘোষণা দানের নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর রাসূলকে বলেছেন : তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রভু (ও প্রতিপালক) অন্বেষণ করব? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রভু (ও প্রতিপালক)।' (সূরা আনআম : ১৬৪) আর রব ও চূড়ান্ত

পরিচালনার দায়িত্ব তার মালিকের, সেহেতু প্রভুত্বগত তাওহীদ বলতে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে একত্ব বোঝায়। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ জগৎ সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তিনি মালিক ও প্রভু হিসেবে এর পরিচালকও বটে। তাই এমন হওয়া সম্ভব নয় যে, তিনি বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ এর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ফেরেশতামণ্ডলী, নবিগণ ও ওলিদের ওপর অর্পণ করেছেন। বরং তিনি যেমন এর স্রষ্টা তেমনি এর পরিচালকও। সুতরাং বিশ্বের একক ও স্বাধীন পরিচালক আল্লাহ ভিন্ন কেউ নয়। অবশ্য আল্লাহর একক স্বাধীন মূল পরিচালক হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করার অর্থ এটা নয় যে, মহান আল্লাহর সৃষ্ট ও সত্তাগতভাবে তাঁর ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন বস্তু ও অবস্তুগত কারণসমূহের পরম্পরা ও সুশৃঙ্খল ধারার অস্তিত্ব নই। সুতরাং প্রভুত্বগত তাওহীদের অর্থ হল মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের মূল ও একমাত্র স্বাধীন পরিচালক, কিন্তু অন্যান্য পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতায় তাঁর অনুমতিক্রমে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন : (فالمدبّرات امرا) 'শপথ সৃষ্টিজগৎ পরিচালনাকারীদের।' (সূরা নাযিয়াত : ৫)

৫. শাসন ও কর্তৃত্বগত তাওহীদ হল (নিরঙ্কুশ স্বাধীন সত্তা হিসেবে) একমাত্র আল্লাহই তাঁর বান্দাদের ওপর শাসন ও কর্তৃত্বের অধিকার রাখেন। তাঁর অনুমতি ভিন্ন কেউ কোন মানুষের ওপর কর্তৃত্বের অধিকার রাখে না।[১] মহান আল্লাহ বলেন :

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِىُّ

মালিক হওয়ার কারণেই মহামহিম আল্লাহ বিশ্বজগতের পরিচালনা ও জীবসমূহের প্রাণদান ও হরণের পরম ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা বাকারা : ২৫৮)– অনুবাদক

১. আল্লাহ পবিত্র কোরআনে নিজেকে একমাত্র ওয়ালী ও কর্তৃত্বের অধিকারী ঘোষণা করার পাশাপাশি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদেরকেও শাসন ও কর্তৃত্বের অধিকার দান করে বলেছেন : 'তোমাদের শাসক ও অভিভাবক তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই বিশ্বাসীরা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে।' (মায়িদাহ : ৫৫) সুতরাং পূর্বোল্লিখিত দুই আয়াতের উদ্দেশ্য হল কর্তৃত্বের বিষয়টি আল্লাহর নিঃশর্ত মালিকানাধীন বলে ঘোষণা করা– যা তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর প্রজ্ঞার ভিত্তিতে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর অর্পণ করতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায়, আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য হলো কর্তৃত্বের অধিকারের বিষয়টি স্বাধীন ও নিরঙ্কুশভাবে কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা, তাই তাঁর অনুমতিক্রমে অন্যদের সীমিত কর্তৃত্বের অধিকারকে তা খণ্ডন করে না।– অনুবাদক

অর্থাৎ তারা কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদের তাদের অধিকর্তারূপে গ্রহণ করেছে? অথচ আল্লাহই প্রকৃত অধিকর্তা। (সূরা শুরা : ৯)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

তুমি কি জান না যে, আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব কেবল আল্লাহরই? এবং তিনি ব্যতীত তোমাদের না কোন অধিকর্তা আছে, আর না আছে সাহায্যকারী। (বাকারাহ : ১০৭)

৬. আনুগত্যগত তাওহীদ শাসন ও কর্তৃত্বগত তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যেহেতু তিনিই একমাত্র নিরঙ্কুশ ও স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী, সেহেতু একমাত্র নিরঙ্কুশ আনুগত্যের অধিকারীও হলেন তিনি। নিরঙ্কুশ আনুগত্যের বিষয়টি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাঁর নিষ্পাপ বান্দাদের জন্য আনুগত্যের অধিকার দিতে পারেন না। বরং তিনি যখন তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের জন্যও এ ধরনের কর্তৃত্বের অধিকার প্রদান করেন তখন আনুগত্যকারীদের জন্য তাঁদের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্যেরই শামিল। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

যে রাসূলের আনুগত্য করল নিঃসন্দেহে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা : ৮০)

৭. আইন ও বিধানগত তাওহীদ হল আইন ও বিধান প্রণয়ণের অধিকার কেবল মহান আল্লাহর। তিনিই আসমানি কিতাব ও নবিদের প্রেরণ করার মাধ্যমে মানবজাতিকে দুনিয়া ও অনন্তকালের সৌভাগ্যে পৌঁছার উপযোগী বিধানসমূহের সাথে পরিচিত করান। তবে এ ঐশী বিধানের সার্বিক নির্দেশনার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব হল মানবসমাজের নিজের। এক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়তের সার্বিক নীতি থেকে খুঁটিনাটি বিধান বের করার দায়িত্বটি মুজতাহিদ ও বিশেষজ্ঞ আলেমের ওপর অর্পিত হয়েছে।

৮. ইবাদতগত তাওহীদ অর্থ ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। ইসলামের বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে তাওহীদের কোন কোন প্রকারের–যেমন : গুণগত তাওহীদের–বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ইবাদতগত তাওহীদের বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। কেউ তাওহীদের এ মৌলনীতিকে না মানলে মুসলমান বলা যায় না। মহান আল্লাহ কর্তৃক সকল নবিকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল এ মৌলনীতিকে প্রতিষ্ঠা করা। আর ইতিহাসে যখনই মানুষ তার সহজাত ঐশী প্রবণতা থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রকৃত উপাস্যের পরিবর্তে সৃষ্টিজগতের কোন জীবিত অথবা নির্জীব সত্তার ইবাদতে রত হয়েছে তখন নবিরা এসেছেন মানুষকে তাদের ঐশী সহজাত প্রবণতায় ফিরিয়ে আনতে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন :

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ

(প্রথমে) সমুদয় মানুষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, অতঃপর (তারা ফিতরাত থেকে দূরে সরে গিয়ে যখন বিভ্রান্তিতে পতিত হল), তখন আল্লাহ (মুক্তির) সুসংবাদদাতা এবং (শাস্তির) সতর্ককারীরূপে নবিগণকে প্রেরণ করলেন। (সূরা বাকারাহ : ২১৩)

ইবাদতগত তাওহীদের বিষয়টি যে সকল নবির মূল মিশন ছিল তার উল্লেখ করে পবিত্র কোরআন বলছে :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ

অর্থাৎ আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা আল্লাহরই উপাসনা কর এবং ঔদ্ধত্যকারীকে (ভ্রষ্টদের দলপতিদের ও মূর্তিগুলোকে) পরিহার কর। (সূরা নাহল : ৩৬)

সুতরাং এ মৌল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সকলেই একমত যে, ইবাদতের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা তাওহীদ থেকে স্পষ্ট বিচ্যুতি ও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তা থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য। যদি এ বিষয়ে কোন

মতপার্থক্য থাকে তা শির্‌কের দৃষ্টান্ত নিয়ে, যেমন আল্লাহর ওলিদের মাধ্যম ও উসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট চাওয়া তাঁদের উপাসনার শামিল, নাকি তা নামায ও রোযার মতই আল্লাহর নৈকট্যের একটি মাধ্যম মাত্র? এ কারণেই এখানে ইবাদতের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণের আবশ্যকতা দেখা দেয় যাতে কোন্ কাজটি ইবাদত ও কোন্ কাজটি ইবাদত বলে গণ্য নয় তার মানদণ্ড আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইবাদতগত ও প্রভুত্বগত তাওহীদের মধ্যে পার্থক্য

কোন কোন ফিরকার আলেমরা তাওহীদকে সৃষ্টিগত তাওহীদ ও ইবাদতগত তাওহীদ এ দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, বর্তমানের মুসলমানরা চিন্তাধারায় জাহেলিয়াতের যুগের আরবদের মত হয়েছে। তারা আল্লাহর স্রষ্টা হওয়ার বিষয়টিতে বিশ্বাসী হলেও উপাস্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহর পাশাপাশি তাঁর বান্দাদেরও উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, তারা জাহেলি যুগের মুশরিকদের ন্যায় নবিগণ ও পুণ্যবান বান্দাদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চায় ও তাঁদের সাহায্য কামনা করে। আর এটা তাদের উপাসনা ও আল্লাহর সাথে তাদের অংশী সাব্যস্ত করার শামিল। যদি আল্লাহকে একক প্রভু বলে স্বীকার করাই যথেষ্ট হত, তাহলে নবি (সা.)-এর যুগের মুশরিকরা সবাই মুক্তি লাভ করত।[১]

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এক, রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বগত তাওহীদকে এ ফিরকার আলেমরা খালিকিয়্যাত বা সৃষ্টিগত তাওহীদের সমার্থক গণ্য করেছেন যা একটি মারাত্মক ভুল। কেননা, যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'রুবুবিয়্যাত' শব্দটি 'রব' শব্দ–যার অর্থ প্রভু ও অধিকারী–থেকে উদ্ভূত। কোন প্রাণী, বস্তু বা সম্পদের অধিকারী হওয়া সৃষ্টির চেয়ে পরিচালনা ও প্রতিপালনের সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট। যেমন একটি ঘোড়ার মালিক তার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে সেটার বেঁচে থাকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং একটি ক্ষেতের মালিক ফসলের পরিচর্যার জন্য বাগানে সার দেয় ও পানি সিঞ্চন করে। মালিক হিসেবে সে এ কাজগুলো অর্থাৎ প্রতিপালন ও পরিচালনা বা পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে থাকে। এ দুই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে, সৃষ্টি ও পরিচালনা দু'টি ভিন্ন

১. ফাতহুল মাজিদ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (মৃত্যু ১২৮৫ হিজরি), পৃ. ১২ ও ২০

বিষয়।[১] সুতরাং সৃষ্টিগত তাওহীদ ও প্রভুত্বগত তাওহীদকে একই গণ্য করা সমীচীন নয়।

দুই, এ ফিরকার আলেমরা অপর যে ভুলটি করেছেন তা হল 'ইলাহ' শব্দের অর্থ করেছেন 'উপাস্য'। কিন্তু পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় কখনই তা সঠিক নয়; বরং সঠিক হল 'আল্লাহ' ও 'ইলাহ' শব্দের অর্থ (বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায়) একই; শুধু পার্থক্য এটা যে, 'আল্লাহ' হল নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) আর 'ইলাহ' হল জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)। প্রথমটি (আল্লাহ) একমাত্র অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য অসীম সত্তা ব্যতীত কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয়টি সাধারণভাবে খোদা বলে প্রচলিত ও কল্পিত সকল সত্তার–প্রতিমা হোক বা অন্য কোন বস্ত বা অবস্তুগত কিছু–ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যদিও তারা নামমাত্র খোদা হয়ে থাকে তবুও তাদের 'ইলাহ' নামকরণ করা হয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ

তোমরা তাঁকে (সেই আল্লাহকে) ছেড়ে যারই উপাসনা কর, সেগুলো নাম ব্যতীত কিছু নয় যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা (মনগড়াভাবে) রেখেছ। আল্লাহ সেগুলো সম্বন্ধে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। (সূরা ইউসূফ : ৪০)[১]

১. তবে কেউ কোন কিছুর স্রষ্টা হলে আবশ্যিকভাবে সে তার রব বা প্রভু ও মুদাব্বির বা পরিচালক হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু কেউ কোন কিছুর পরিচালনার দায়িত্বে থাকলে আবশ্যিকভাবে তার স্রষ্টা নয়। পবিত্র কোরআনও 'খালিক' ও 'রব' দুই পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে এবং আল্লাহর স্রষ্টা হওয়াকে তাঁর রব বা প্রভু ও প্রতিপালক হওয়ার যুক্তি ও দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন- 'নিশ্চয় তোমাদের রব (প্রতিপালক) হলেন সেই আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (আ'রাফ : ৫৪), তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (ইউনূস : ৩), সে (ফিরআউন) বলল, 'হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে?' সে (মূসা) বলল, 'আমাদের প্রতিপালক হলেন তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকে তার উপযুক্ত রূপদান করেছেন, অতঃপর তিনি পথনির্দেশ করেছেন।' (ত্বাহা : ৪৯-৫০) এ তিন আয়াতে প্রতিপালন ও প্রভুত্বকে সৃষ্টি থেকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহর প্রভু হওয়ার বিষয়টিকে তাঁর স্রষ্টা হওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।– অনুবাদক

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, 'ইলাহ' শব্দের অর্থ উপাস্য বা মা'বুদ নয়। কারণ, তা হলে বেশ কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা ও অনুবাদের ক্ষেত্রে মৌলিক সমস্যা দেখা দেবে। যেমন- لو كان فيهما الهة الاّ الله لفسدتا আয়াতটির অর্থ যদি এটা হয় যে, 'যদি এ দুয়ের (আকাশশণ্ডলী ও পৃথিবীর) মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যরা থাকত তবে তারা উভয়ে (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী) ধ্বংস হয়ে যেত।' কারণ, কখনই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ও সত্তার উপাসনা করা বিশ্ব বা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কারণ হয় নি। বর্তমানেও পৃথিবীতে অসংখ্য মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা বিদ্যমান। যৌক্তিকভাবে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সত্তাগুলোর উপাসনা সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বজগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন কারণ হতে পারে না। বরং এ বিশ্বজগৎ তখনই ধ্বংসের মুখোমখি হবে যখন আল্লাহ ভিন্ন সত্তারা আল্লাহর ন্যায় সার্বভৌম ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হবে অর্থাৎ কালামশাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের প্রত্যেকে ওয়াজিবুল উজুদ বা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য স্বয়ম্ভু সত্তা হবে ও তারা প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত বিশ্বজগতকে পরিচালনা করতে চাইবে। যেহেতু তাদের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু নিজের জ্ঞান ও ক্ষমতার আলোকে বিশ্বকে চালাতে চাইবে আর তখনই সংঘর্ষ ও সংঘাত দেখা দেবে এবং বিশ্ব ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। সুতরাং আয়াতে 'ইলাহ' শব্দের অর্থ উপাস্য নয়' বরং সেই সত্তা যার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য এবং সে স্বাধীন ও অনির্ভরশীল হিসেবে নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এরূপ- 'যদি এ দুয়ের (আকাশশণ্ডলী ও পৃথিবীর) মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য স্বয়ম্ভু সত্তারা থাকত তবে তারা উভয়ে (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী) ধ্বংস হয়ে যেত।' অর্থাৎ আয়াতে 'ইলাহ' শব্দকে আল্লাহ অর্থে গ্রহণ করলেই কেবল অর্থ সঠিক হবে, নতুবা নয়। অন্য আয়াতের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত–

قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٗ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ﴿٤٢﴾

১. ইংরেজিতেও 'আল্লাহ' বুঝাতে নামবাচক বিশেষ্য হিসেবে 'গড' শব্দটিতে 'জি' অক্ষরটি বড় হাতের বা ক্যাপিটাল লেটারে লেখা হয় এবং জাতিবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে 'গড' শব্দটিতে 'জি' অক্ষরটি ছোট হাতের বা স্মল লেটারে লেখা হয়।– লেখক

তুমি বল, 'যদি তাঁর সাথে, যেমন তারা বলে, আরও ইলাহ থাকত সেক্ষেত্রে অবশ্যই তারা আরশের অধিপতির নিকট পৌঁছবার কোন পথ বের করত।' (সূরা বনি ইসরাঈল : ৪২)

আয়াতটির ব্যাখ্যা হল তাদের ধারণায় বিদ্যমান খোদারা যদি স্বয়ম্ভু ও সার্বভৌম সত্তার অধিকারী হত তবে তারা প্রত্যেকে আরশ দখল অর্থাৎ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের সার্বভৌম ক্ষমতাকে ব্যবহার করত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের 'ইলাহ' শব্দকে উপাস্য অর্থে গ্রহণ করলে উপাস্যরা (সকল বৈশিষ্ট্যে) আল্লাহর সমপর্যায়ে গণ্য হয় না, ফলে তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রসঙ্গ আসে না।[১]

নিম্নোক্ত আয়াতটিও এরূপ–

وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾

আর তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই। অন্যথায় প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং তারা একে অপরের ওপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করত। (সূরা মুমিনুন : ৯১)

আয়াতটিতে এ যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহর সঙ্গে বা পাশাপাশি একই রূপ বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার অধিকারী আরেক খোদার অস্তিত্ব উভয়কে সৃষ্টি জগতে স্বীয় প্রভাব খাটাতে ও নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্ররোচিত করত যা তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের জন্ম দিত ও তারা একে অপরের ওপর প্রবল হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হত। কিন্তু 'ইলাহ'কে উপাস্য অর্থে ধরা হলে এবং সে উপাস্যের সৃষ্টিজগতে কোন পরিচালনাগত ক্ষমতা না থাকলে তবে তার পক্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য

১. মুশরিকরা তাদের কাছে খোদা বলে গণ্য সত্তাগুলোকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করত বলেই মহান আল্লাহ এ বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাও এ বিষয়টি স্বীকার করবে যে, তারা তাদের উপাস্যদের আল্লাহর ন্যায় মনে করত। পবিত্র কোরআন বলছে যে, তারা সেদিন বলবে, 'আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় ছিলাম, যখন আমরা তোমাদের (উপাস্যদের) জগৎসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ জ্ঞান করেছিলাম।' (সূরা শুয়ারা : ৯৭-৯৮)– অনুবাদক

আল্লাহর মোকাবিলায় দাঁড়ানোর বিষয়টি অর্থহীন হয়ে যেত। তাই অবশ্যই 'ইলাহ' বলতে আয়াতে আল্লাহর ন্যায় ক্ষমতার অধিকারী সত্তা বোঝানো হয়েছে।

অপর যে আয়াতটিতে 'ইলাহ' শব্দটি আল্লাহর সমবৈশিষ্ট্যের সত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল নিম্নের আয়াতটি :

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٩٩﴾

(জেনে রাখ) নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর, (সকলে) জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং তোমরা তাতে প্রবেশকারী হবে। যদি এগুলো ইলাহ (স্বয়ম্ভু ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) হত, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, অথচ তারা সকলে সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (সূরা আম্বিয়া : ৯৮-৯৯)

এ আয়াতেও 'ইলাহ' শব্দটি আল্লাহর নাম ও তাঁর বৈশিষ্ট্যের সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, নিজেকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ থেকে রক্ষা করতে হলে শুধু উপাস্য হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং তার আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি থাকতে হবে। তবেই সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

সুতরাং উপরিউক্ত চারটি আয়াত মহান আল্লাহর একত্বের সপক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল উপস্থাপন করছে। আয়াতগুলোতে 'ইলাহ; শব্দটিকে 'উপাস্য' অর্থে ধরলে তা আল্লাহর একত্বের প্রমাণে অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ, একাধিক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্বয়ম্ভু সত্তা থাকলেই কেবল সৃষ্টিজগৎ অরাজকতা ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, একাধিক উপাস্য থাকার কারণে নয়। সার্বভৌম ও স্বাধীন একাধিক স্বয়ম্ভু সত্তার উপস্থিতিই কেবল তাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্যের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর আরশ দখলের প্রচেষ্টায় রত করবে। কখনই মানুষ কর্তৃক আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য গ্রহণ সৃষ্টিজগতে এমন বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে না। বরং বাস্তবজগতে আল্লাহর ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র সত্তা ও অনুরূপ খোদার অস্তিত্বই এমন সমস্যার জন্ম দেবে। শুধু কোন ইলাহ ও সত্তা আল্লাহর মোকাবিলায় দাঁড়ানোর মত সর্বময় শক্তির অধিকারী হলেই আল্লাহ চাওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে জাহান্নামে প্রবেশ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

সাধারণ ও সর্বজনীন অর্থে আল্লাহ নামের ব্যবহার

কখনও কখনও পবিত্র কোরআনে 'আল্লাহ' শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে জাতিবাচক বিশেষ্য হিসেবে 'ইলাহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি–

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি রাজাধিপতি, অতীব পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতীব মহান; আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহামহিম– যাকে তারা (তাঁর) অংশী সাব্যস্ত করে। তিনিই আল্লাহ, (সমুদয় জিনিসের) সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর : ২৩-২৪)

এ দুই আয়াতে প্রথমে 'আল্লাহ' নামটি নামবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে 'ইলাহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সার্বিক এক অর্থ নির্দেশ করছে। অতঃপর যখন পরবর্তী শব্দগুলোতে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তখন বিশেষায়িত হয়েছে। অন্য আয়াতেও এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন :

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

তিনিই হলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ; তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও জানেন। (সূরা আনআম : ৩)

উপরিউক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ যাতে 'ইলাহ' শব্দটি 'আল্লাহ' শব্দের স্থলে ও অর্থে এসেছে :

وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَـٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَـٰهٌ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

আর তিনিই হলেন আকাশে ইলাহ এবং পৃথিবীতে ইলাহ এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞাতা। (সূরা যুখরুফ : ৮৪)

এ সম্পর্কিত আলোচনা অপর একটি আয়াতের উল্লেখের মাধ্যমে শেষ করছি। আয়াতটি হল :

وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ

এ কথা বল না যে, (আল্লাহ) তিন (জন)। ক্ষান্ত হও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। শুধু আল্লাহই হলেন একক ইলাহ। তিনি এর ঊর্ধে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। (সূরা নিসা : ১৭১)

এ আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, 'আল্লাহ' ও 'ইলাহ' শব্দের অর্থ একই, তাদের মধ্যে শুধু এ পার্থক্য রয়েছে যে, ইলাহ শব্দটি ব্যাপক ও প্রশস্ত অর্থাৎ সার্বিক এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তাদের একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়।

এ আয়াতটিসহ পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে একটি সার্বিক মৌলনীতি হস্তগত হয়। আর তা হল 'ইলাহ' ও উলুহিয়্যাত' এর অর্থ উপাস্য ও উপাসনা নয়; বরং স্বয়ম্ভু, সর্বভৌম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব। সুতরাং বিভিন্ন ফিরকার গ্রন্থসমূহে ইবাদত বা দাসত্বের ক্ষেত্রে তাওহীদকে যে উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদ অর্থ করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

জাহিলিয়াতের যুগে আরব সমাজ ও রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্ক

অনেক আলেমই তাঁদের লেখায় এ দাবি করেছেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরবে শুধু একধরনের শির্ক ছিল; আর তা হল ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক। কেননা, তারা তাদের মূর্তিপূজার যুক্তি হিসেবে বলত :

مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ

আমরা এদের (মূর্তিগুলো) উপাসনা করি এজন্য যে, এরা আমাদের আল্লাহর একেবারে নিকটবর্তী করে। (সূরা যুমার : ৩)

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ

এবং তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের না ক্ষতি করতে পারে, আর না উপকার করতে পারে। আর তারা বলে, 'আল্লাহর নিকট এরাই আমাদের সুপারিশকারী।' (সূরা ইউনূস : ১৮)

কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা শুধু ইবাদতের বিষয়েই শির্ক করত না, তাদের অনেকেই সৃষ্টিজগতে তাদের হাতে তৈরি প্রতিমাগুলোর–বা ঐ মূর্তিগুলো যেগুলো ফেরেশতা বা মানুষের ছিল তাদের–স্বাধীন পরিচালনা ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল। বরং বাস্তবতা হল রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্কের প্রচলনের মাধ্যমেই মক্কায় প্রথম মূর্তিপূজা শুরু হয়েছিল। তারা আল্লাহর স্থলে বিভিন্ন মূর্তিকে বিশ্বের বিভিন্ন কর্ম পরিচালনার স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা মনে করত।[১] ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, মক্কার প্রধান আমর ইবনে লুয়াই সিরিয়ার বোলকা'য় সফরে গিয়ে লক্ষ্য করে যে, একদল লোক মূর্তিপূজায় রত হয়েছে। তাদের প্রতিমাপূজার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা বলে : আমরা এদের কাছে বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করলে বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং কোন সাহায্য চাইলে সাহায্য করে। তাদের প্রচারণা ও কথায় প্রভাবিত হয়ে সে হোবাল নামক একটি দেবতার মূর্তি সেখান থেকে কিনে নিয়ে আসে ও কাবাঘরে তা স্থাপন করে

১. যেমন সম্মান দান, যুদ্ধে বিজয় দান ইত্যাদি ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। দ্রষ্টব্য: সূরা ইয়াসীন: ৭৪; সূরা মারইয়াম : ৮১; সূরা আহকাফ : ২৮। উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান ও তার অনুসারীরা তাদের পেছনে 'উজ্জা' নামক উপাস্যের সাহায্য রয়েছে বলে দাবি করে স্লোগান দিচ্ছিল এ বলে যে, نحن لنا العزّي و لا عزّي لكم 'আমাদের আছে উজ্জা দেবতা (যে আমাদের সাহায্য করে)। কিন্তু তোমাদের কোন উজ্জা নেই।'– অনুবাদক

মূর্তিপূজার দিকে অন্যদেরকে আহ্বান করে। অন্যরা পরবর্তীকালে তার অনুসরণ করা শুরু করে। আর এভাবেই মক্কায় মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটে।[১]

ইবাদতের সংজ্ঞা

এখন আমরা ইবাদতের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব যার সঠিক অর্থ না জানলে ইবাগতগত তাওহীদের ক্ষেত্রে মহাবিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। আমরা এ বিষয়টি এখানে স্পষ্ট করব যে, ইবাদত অর্থ কখনই সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন, স্বীয় ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ও নম্রতার সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়। এমনকি কারো সামনে চরম হীনতার সাথে মাথা নত করাও ইবাদত বলে গণ্য হয় না। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা দুটি শিরোনামে আলোচনার অবতারণা করছি। এক. চূড়ান্ত বিনয় ও হীনতার প্রকাশ ইবাদত নয়; দুই. কোন কিছু ইবাদত হওয়ার আবশ্যক শর্ত হল উপাস্যের ব্যাপারে স্বাধীন ও সর্বভৌম রব ও ইলাহ হওয়ার বিশ্বাস পোষণ।

১. ইবাদত অর্থ হীনতা ও বিনয় প্রকাশ নয় : যদিও বিভিন্ন গ্রন্থে 'ইবাদত' শব্দের অর্থ করা হয়েছে ক্ষুদ্রতা ও বিনয় প্রকাশ। কিন্তু এ অর্থটি 'ইবাদত' শব্দের সার্বিক ও আবশ্যিক অর্থ– প্রকৃত অর্থ নয়। আমরা সবাই জানি, পিতা-মাতার সামনে ক্ষুদ্রতা প্রকাশের দ্বারা বিনয় দেখানো, শিক্ষকের সামনে ছাত্রদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা নত করা কখনই তাঁদের ইবাদত বলে গণ্য হয় না। পবিত্র কোরআন থেকেও এ দাবির সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ এবং তাঁদের (পিতা-মাতা) সম্মুখে বিনয়-নম্র হয়ে নিজের কাঁধ নত করে দেবে। (সূরা বনি ইসরাঈল : ২৪)

কেউ বলতে পারে, শুধু বিনয় প্রকাশ ইবাদত বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ব্যক্তিকে কোন পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে তার সামনে চরম মাত্রায় বিনয় প্রদর্শন হল ইবাদত। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, ফেরেশতাগণ যখন হযরত আদম (আ.)-এর মহান মর্যাদার বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁর সামনে সিজদাবনত হলেন তদুপরি তা কেন ইবাদত বলে গণ্য হল না? বরং এটা তাঁর প্রতি সম্মানের প্রতীক বলে বিবেচিত হয়েছে।

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯

পবিত্র কোরআন বর্ণনা করছে :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ...

এবং যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলিস ব্যতীত তাদের সকলেই সিজদা করল... (সূরা বাকারাহ : ৩৪)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

যা কিছুই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত রয়েছে। (সূরা রাদ : ১৫)

সুতরাং হযরত আদমের সামনে ফেরেশতাদের সিজদার ধরনের সাথে আল্লাহর সামনে তাদের সিজদার ধরনের কোন পার্থক্য নেই। কারণ, আল্লাহ ও আদম (আ.) উভয়ের সামনে সিজদার উল্লেখ করতে কোরআন لام অক্ষর (لآدما فسجدوا) ও (لله يسجد) ব্যবহার করেছে। প্রথম ক্ষেত্রে ফেরেশতারা সিজদার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিনয় প্রদর্শন করলেও তা ইবাদত বলে গণ্য হয়নি, অথচ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য সিজদা ইবাদত বলে বিবেচিত হয়েছে। হযরত ইউসূফের জন্য তাঁর পিতা-মাতা ও ভ্রাতাদের সিজদার ক্ষেত্রেও এ কথাটি প্রযোজ্য।

কোরআন বর্ণনা করছে :

وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ

এবং সকলেই তার (ইউসূফের) সম্মুখে সিজদাবনত হল। সে (ইউসূফ) বলল, 'হে আমার পিতা! এটা আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক যা বাস্তবায়িত করেছেন। (সূরা ইউসূফ : ১০০)

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, ইবাদতকে ক্ষুদ্রতা, হীনতা, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন অর্থে গ্রহণ করা যায় না। আর যেহেতু এ অর্থগুলো থেকে ইবাদতের অর্থ ভিন্ন তাই ইবাদতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে অন্য আয়াতসমূহের সাহায্য নিতে হবে।

একটি অদ্ভুত উত্তর

কেউ কেউ পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত কর্মগুলো ইবাদত না হওয়ার যুক্তি হিসেবে এমন কিছু বলেছেন যা শুনে সকলেই বিস্মিত হবে। তাঁদের কথা হল, যেহেতু আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা হযরত আদমকে সিজদা করেছেন সেহেতু তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না। তাদের ভাষায়, আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সিজদা করলে তা আল্লাহকে সিজদা করারই শামিল হবে। আমাদের প্রশ্ন হল, কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ যদি এক সৃষ্টিকে (মাখলুক) অপর সৃষ্টির সামনে সিজদা করতে বলেন তবে তা ঐ (সিজদাকৃত) সৃষ্টির ইবাদত বলে গণ্য হবে না, অথচ এমনিতেই কোন সৃষ্টি অপর সৃষ্টিকে সিজদা করলে তা ইবাদত হয়ে যাবে? অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদম (আ.)-কে সিজদা করার কাজটি যদি প্রকৃতই ইবাদত বা ইবাদতের একটি রূপ হয়ে থাকে তবে আল্লাহর নির্দেশের কারণে তা কিভাবে ইবাদতের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ হওয়া থেকে মুক্ত হবে? যেহেতু এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ইবাদত হল কাউকে সিজদা করা, সেহেতু যে কাউকে–আল্লাহ হোক বা মানুষ–সিজদা করা মাত্রই তা ইবাদত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় এ সংজ্ঞাকে আল্লাহর নির্দেশের শর্তাধীন করার কোন সুযোগ নেই। কারণ, স্বয়ং এ কাজটি ইবাদত, তা আল্লাহ বলুন বা না বলুন। তা না হলে এ ইবাদতকে বৈধ ও অবৈধ এ দু'ভাগে করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশে হলে তা বৈধ ইবাদত, আর না হলে অবৈধ ইবাদত। সেক্ষেত্রে বলতে হবে, ফেরেশতা ও মানুষরা অন্য কোন মানুষ বা সৃষ্টিকে সিজদা করার মধ্যে সত্তাগতভাবে ভালো বা মন্দ বলে কিছু নেই। কেবল আল্লাহর নির্দেশই তাকে ভালো ও মন্দত্ব দান করে। কিন্তু মূল বিষয় হল ইবাদত করাকে যদি সিজদা করা অর্থ করা হয় তবে এ ব্যাখ্যা ধোপে টিকে না। কারণ, তাহলে বিষয়টি এমন হয় যে, ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে হযরত আদমের উপাসনা করেছেন। অথচ আল্লাহ কখনই নিজ ভিন্ন কাউকে ইবাদতের নির্দেশ দিতে পারেন না। কারণ, তা ঐ উপাসিত সত্তাকে আল্লাহর সাথে অংশী করার শামিল যা মহাঅন্যায় ও বড় ধরনের পাপের কাজ। নিশ্চয় আল্লাহ কখনও মন্দ ও অন্যায় কর্মের নির্দেশ দান করেন না।

قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

(হে রাসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আল্লাহ মন্দকর্মের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ওপর এমন কিছু আরোপ কর যা তোমরা জান না। (সূরা আ'রাফ : ২৮)

কেউ কেউ বলে থাকেন, ফেরেশতারা আল্লাহকেই সিজদা করেছেন, কিন্তু হযরত আদমকে এক্ষেত্রে কিবলা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের এ উত্তর সঠিক নয় এজন্য যে, কোরআনে আল্লাহর জন্য ও হযরত আদমের জন্য সিজদা– উভয় ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশ্যে তা সংঘটিত হওয়া বুঝাতে لام অক্ষর (اسجدوا لله،...اسجدوا لادم) ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়াও হযরত আদমের সিজদা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ আদম (আ.)-এর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁকে মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন সিজদা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করতে। অন্যদিকে এ উত্তরটি হযরত ইউসূফকে যে হযরত ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানরা সিজদা করেছেন সেক্ষেত্রে আদৌ সঠিক নয়। কারণ, পবিত্র কোরআন তাদের সিজদাকে হযরত ইউসূফের স্বপ্নের বাস্তব রূপ লাভ বলে উল্লেখ করেছে। কোরআন তাঁর স্বপ্নকে এভাবে বর্ণনা করেছে :

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾

নিশ্চয় আমি এগারটি তারা ও চন্দ্র ও সূর্যকে আমার জন্য (প্রতি) সিজদা করতে দেখেছি। (সূরা ইউসূফ : ৪)

সুতরাং হযরত ইউসূফের পিতা-মাতারা প্রকৃতই তাঁকে সিজদা করেছেন। তাই এ ধরনের ব্যাখ্যা যাঁরা দেন তাঁরা বাস্তবে এখন পর্যন্ত ইবাদতের সঠিক সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা এখানে ইবাদতের সঠিক সংজ্ঞা দেয়ার মাধ্যমে এ বিতর্কের অবসান ঘটাতে চাই।

২. ইলাহ ও রব হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখা ইবাদতের মূল শর্ত ও রোকন

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ইবাদতের একটি দিক ও রুকন হল কোন সত্তার সামনে কথা বা আচরণের দ্বারা বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ। কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রুকনটি ইবাদতের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে তা হল এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসের দিকটি যার প্রকাশস্থল হল মানুষের হৃদয়। কোন সত্তার সামনে বিনয় প্রকাশ তখনই ইবাদত বলে গণ্য হবে যখন ব্যক্তি ঐ সত্তার প্রতি বিশেষ বিশ্বাস পোষণ করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনে যে সত্তার প্রতি ক্ষুদ্রতা ও বিনয় প্রকাশ করছে তার বিষয়ে ঐ বিশেষ বিশ্বাস পোষণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না, এমনকি যদি তা সিজদার পর্যায়েও পৌঁছায়।[১] এখন দেখতে হবে, ঐ বিশেষ বিশ্বাসটি কী– যা পোষণ করলে তা ইবাদতের রূপ ধারণ করবে। অন্য ভাষায় বলা যায়, ইবাদত গঠনকারী আবশ্যক উপাদানটি কী?

এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য আমাদেরকে প্রথমে আল্লাহ ও মূর্তির সামনে বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশের সময় একত্ববাদী ও মুশরিকদের বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য যাচাই করতে হবে। কারণ, এ দুয়ের একটি হল প্রকৃত ইবাদত ও অপরটি মিথ্যা ও বাতিল ইবাদত। সবাই এ বিষয়টি জানে ও স্বীকার করে যে, একজন মুমিন যখন আল্লাহর ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় তখন তার মনে এ বিশ্বাস নিয়েই দাঁড়ায় যে, তিনি বিশ্বজগতের প্রভু ও প্রতিপালক এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সর্বময় সত্তা (ইলাহ) হিসেবে তাঁর হাতেই তার জীবন, মৃত্যু ও সার্বিক বিষয় ন্যস্ত। অর্থাৎ আল্লাহকে সে সৃষ্টিজগতের রব ও ইলাহ মনে করে তাঁর প্রতি তার সত্তাগতভাবে মুখাপেক্ষিতাকে স্মরণ করে তাঁর সামনে নিজেকে আত্মসমর্পিত রূপে পেশ করে। এ ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শুধু ক্ষুদ্রতা ও বিনয় প্রকাশ ইবাদত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং যখন বিনয় প্রকাশকারী যার সামনে বিনয় প্রকাশ করছে ও তার প্রশংসা করছে তাকে ইলাহ, রব, বিশ্বজগতের ওপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী এমন এক স্বাধীন পরিচালক– যার হাতে তার ভাগ্য নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করবে, তখনই তার ইবাদত ও উপাসনা করল। যদি কোন একত্ববাদী আল্লাহর প্রতি এমন বিশ্বাস না রেখে তাঁর সামনে নত হয় (যেমনটি মুনাফিকরা করে থাকে) তবে তার এ প্রশংসামূলক কথা ও আচরণ (বিনয় দেখানো) ইবাদত হবে না।

মুশরিকদের আচরণ (মূর্তির সামনে সিজদা ও মাথা নত করা) এজন্য ইবাদত বলে গণ্য হত যে, তারা মূর্তিকে সাধারণ একটি মাটির পুতুল মনে করত না; বরং বিশ্বাস করত বিশ্বজগতে এ মূর্তিদের স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। অন্য ভাবে বলা যায়, তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র খোদা মনে করত যাদের হাতে বিশ্বের একেক

১. এক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামি শরীয়তে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন সত্তাকে সিজদা করা হারাম ও নিষিদ্ধ যা বিধান ও কর্মগত একটি বিষয়। এর সাথে উপরিউক্ত বিশ্বাসগত বিষয়ের আলোচনার সংশ্লিষ্টতা নেই।– অনুবাদক

অংশের পরিচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে এবং তারা স্বাধীনভাবে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা রাখে। তারা মূর্তিদের ব্যাপারে অন্তত এ বিশ্বাস রাখত যে, তারাই বৃষ্টিবর্ষণকারী, যুদ্ধে জয়দানকারী, অভাব পূরণকারী (সম্পদ দানকারী) এবং সম্মান দানকারী অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত। তাদের দৃষ্টিতে তারা হল বিশ্বের একেক অংশের স্বাধীন প্রভু এবং আল্লাহ হলেন তাদের সকলের প্রভু ও রব। তাই যেহেতু এ সকল প্রতিমার পরিচালনাধীন অংশকে আল্লাহ তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন সেহেতু তাঁর পাশাপাশি তারাও ইলাহ হিসেবে উপাস্য বলে বিবেচিত। কোন কোন মূর্তিপূজক দল যদিও সরাসরি এ কথা বলে না যে, প্রত্যেক মূর্তি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রভু, কিন্তু এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তাদের ভাগ্য এ প্রতিমাদের হাতে ন্যস্ত। তাই তারা বলত : 'তাদের পাপমোচন ও পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য এরা আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ স্বাধীন সুপারিশকারী।' অর্থাৎ তারা মূর্তিদের সুপারিশ পাওয়ার জন্য তাদের কল্পিত উপাস্যদের আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদন লাভের প্রয়োজন আছে বলে মনে করত না। এসকল ক্ষেত্রে তারা মূর্তিদের আল্লাহর সমকক্ষ ও একই রূপ সম্মানের অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার বিশ্বাস রাখত। কোরআন তাদের এরূপ বিশ্বাসকে বিভিন্ন আয়াতে তুলে ধরেছে। উদাহরণস্বরূপ :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর স্থলে (পরিবর্তে) অন্যদেরকে তাঁর সদৃশ (ও সমকক্ষ) গ্রহণ করে থাকে (এবং) তাদের প্রতি তেমন প্রীতি রাখে যেমন প্রীতি আল্লাহর প্রতি রাখা প্রয়োজন। (সূরা বাকারা : ১৬৫)

কিয়ামতের দিন মুশরিকরা স্বীকারোক্তি করবে :

تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾

'আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় ছিলাম, যখন আমরা তোমাদের (উপাস্যদের) জগৎসমূহের প্রতিপালকের সমান (সমকক্ষ) জ্ঞান করেছিলাম।' (সূরা শুয়ারা : ৯৭-৯৮)

আয়াতে যে বলা হয়েছে, তারা এ কথা স্বীকার করবে যে, তারা মূর্তিদের আল্লাহর সমান বলে বিশ্বাস করত ও এজন্য তারা অনুশোচিত হবে, তার কারণ কী?

নিঃসন্দেহে এর কারণ হল অদ্বিতীয়, অনুপম ও অসদৃশ আল্লাহর পাশাপাশি তাঁর অনুরূপ সত্তায় বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা আল্লাহর একত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারা যে ইবাদত ও উপাসনার ক্ষেত্রে মূর্তিদেরকে আল্লাহর মত গুরুত্ব দিয়েছে তার কারণ হল তারা সেগুলোকে (বিশেষ ক্ষেত্রে) আল্লাহর ন্যায় রব, ইলাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করত। এরূপ বিশ্বাসের কারণেই তারা মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হয়েছিল। যদি তারা সেগুলোকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস না করত তবে কখনই সেগুলোর সামনে এভাবে নত হত না। তবে কাউকে ইলাহ ও রব মানার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আবশ্যক নয় যে, সব দিক থেকে মূর্তি ও অন্যান্য উপাস্যকে আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞান করতে হবে; বরং কয়েকটি, এমনকি একটি ক্ষেত্রে সমরূপ হওয়ার বিশ্বাস শির্কে পর্যবসিত হবে। যেমন আরবদের প্রায় সকলেই মূর্তিদের নয়, বরং আল্লাহকেই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা বলে মানত। কিন্তু তাদের একটি বড় অংশ সম্পূর্ণ বিশ্বের বা তার একাংশের পরিচালনাভার সম্পূর্ণরূপে তাদের কল্পিত উপাস্যদের হাতে ন্যস্ত বলে বিশ্বাস করত। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মক্কায় মূর্তিপূজার প্রচলন রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্ব ও প্রতিপালনের বিষয়ে শির্ক দিয়ে শুরু হয়েছিল। মুশরিকদের অপর অংশ রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাস না রাখলেও মুর্তিদের তাদের সৌভাগ্য ও বিপর্যয়ের (দুর্ভাগ্য) নিয়ন্ত্রক বলে ধারণা করত।

অন্যভাবে বলা যায়, নবুওয়াতের প্রথম যুগের মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সাহায্যকারী, সম্মান ও অসম্মানের সর্বময় কর্তা ও নিয়ামক হওয়ার বিশ্বাস রাখত।

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ

এবং তাদেরকে বলা হবে : আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা উপাসনা করতে তারা কোথায়? তারা কি তোমাদের সাহায্য করবে, না তারা (নিজেরা)ই (জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য) সাহায্য কামনা করবে? (সূরা শুয়ারা : ৯২-৯৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে :

أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

তাদের জন্য আমরা ভিন্ন কোন ইলাহ (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্বাধীন সত্তা) আছে কি যে তাদের শাস্তি থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে। তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং (শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য) আমাদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা পাবে না। (সূরা আম্বিয়া : ৪৩)

এ আয়াতগুলো ও বিশেষত ঐ আয়াতগুলো যেগুলোতে সাহায্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ দানের ক্ষেত্রে মূর্তিদের অক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের বিষয়ে বিশেষ বিশ্বাস রাখত অর্থাৎ শুধু বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও প্রভু আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে তাদের উপাস্যদের ওপর আরোপ করত। যদিও তাদের অনেকে এ পার্থক্যে বিশ্বাসী ছিল যে, মূর্তিদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো আল্লাহর থেকে সীমিত। তবে মুশরিকদের সকলেই তাদের জীবনধারণের উপকরণসমূহ এ উপাস্যদের এখতিয়ারাধীন হিসেবে তাদের ভাগ্য সেগুলোর হাতেই ন্যস্ত বলে বিশ্বাস রাখত।

এ আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইবাদতের প্রকৃত সংজ্ঞা হল : কোন সত্তার বিষয়ে নিরঙ্কুশ ভাগ্যনির্ধারক এবং ইলাহ ও রব হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে তার প্রশংসা করা ও তার সামনে নত হওয়া। তাই এরূপ বিশ্বাস নিয়ে কেউ কারো সিজদা না করে কেবল তা সামনে মাথা নোয়ালেও তা ইবাদত বলে পরিগণিত হবে। এর বিপরীতে কেউ কারো সামনে এরূপ বিশ্বাস ছাড়া সিজদায় পতিত হলেও তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না। আমরা এ সংজ্ঞাটিকে আরবি ভাষায় বর্ণনা করলে হবে :

العبادة خضوع امام من نعتبره الها او ربّا اومصدرا للاعمال الالهيّة

'ইবাদত হল কোন সত্তার সামনে রব অথবা ইলাহ বা ঐশ্বরিক কর্মের (চূড়ান্ত) উৎস হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে নত হওয়া।' (অতএব, ইবাদত হল এমন কোন সত্তার সামনে বিনয়ী ও নত হওয়া যাকে আমরা বিশ্বজগতের অথবা তার একাংশের প্রভু ও নিরঙ্কুশ

পরিচালক অথবা স্বাধীনভাবে আল্লাহর কর্মের অনুরূপ কর্মসম্পাদনে সক্ষম বলে মনে করি।)

উপরিউক্ত সংজ্ঞায় ঐশ্বরিক কর্ম বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐশ্বরিক কর্ম হল এমন এক কর্ম যাতে কোন ব্যক্তি বা সত্তা নিজেই তার কর্মের একক উৎস এবং এক্ষেত্রে সে কারো থেকে সাহায্য গ্রহণ করে না। যদি কখনও সে কোন উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে সে ক্ষেত্রেও স্বাধীন। সুতরাং স্বাধীন কর্মের অধিকারী অর্থ উপায় ও উপকরণকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করা নয়। বরং স্বাধীনতার অর্থ কর্তা তার কর্মের (কর্ম সম্পাদনের) ক্ষেত্রে অন্য কোন সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয়, এখন সে কর্ম সম্পাদনের জন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করুন বা না করুন, যেমন- লাঠিকে সাপে পরিণত করা। তাই তিনি তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য উদাহরণ হিসেবে আমরা পবিত্র কোরআনে যে আল্লাহ জন্ম ও মৃত্যুদানের বিষয় দুটি নিজের ওপর আরোপ করেছেন তার উল্লেখ করতে পারি। কারণ, তিনি জীবন দানের বিষয়টিকে নিজের প্রতি ছাড়াও হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর আরোপ করেছেন এবং মৃত্যুদানের বিষয়টিকেও ফেরেশতাদের ওপরও আরোপ করেছেন। কোরআন বলছে :

هُوَ ٱلَّذِى يُحۡىِۦ وَيُمِيتُ

তিনিই (আল্লাহ) জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন। (সূরা মুমিন : ৬৮)

অন্যত্র ঈসা (আ.)-এর ভাষায় বলেছেন :

وَأُحۡىِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ

আর আমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতদেরকে জীবিত করি। (সূরা আলে ইমরান : ৪৯)

ফেরেশতাদের ব্যাপারে বলেছেন :

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ رُسُلُنَا ...

যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসে তখন আমাদের প্রেরিতরা (ফেরেশতারা) তার মৃত্যুদান করে...। (সূরা আনআম : ৬১)

সঠিক জ্ঞানশূন্য লোকেরা এ দুই ধরনের আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য দেখতে পায়; কিন্তু তাদের সমস্যা হল তারা ধারণা করে যে, জীবন ও মৃত্যুদানের বিষয়টি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত করা হলে তা আর আল্লাহর কর্ম থাকবে না; কারণ, অন্যের ওপর তা আরোপ করার অর্থ হল সে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই স্বয়ং কাজটি করেছে। অন্যভাবে বললে, তারা মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুদান শর্তহীনভাবে আল্লাহর কাজ। কারণ, তিনি নিঃশর্তভাবে কারো সাহায্য ছাড়াই তা সম্পাদন করে থাকেন; কিন্তু যখন তিনি তা সম্পাদনের জন্য তাঁরই সৃষ্ট কোন মাধ্যম ব্যবহার করবেন তখন আর তা তাঁর কর্ম বলে বিবেচিত হবে না; বরং যে মাধ্যমের সাহায্যে তিনি তা সম্পাদন করেছেন তার কাজ বলে গণ্য হবে। এজন্যই তাদের ধারণায় যখন কোন কর্তা এ কর্মগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে সম্পাদন করবে তখন আর তা আল্লাহর কর্ম হবে না; বরং সে যেন নিজের কাজই সম্পাদন করল অর্থাৎ যদিও তাতে আল্লাহই মূল কারণ, তবুও তা তাঁর স্বাধীন কর্ম নয়।[১]

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আমাদের দেখতে হবে, আল্লাহর কর্মসমূহের ব্যাপারে মুশরিকদের কীরূপ ধারণা ছিল। তারা বিশ্বজগতের একাংশের পরিচালনা, যেমন বৃষ্টিদান, মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ধারণ, সুপারিশ গ্রহণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের উপাস্যদের স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত অর্থাৎ আল্লাহ তাদের উপাস্যদের হাতে বিশেষ কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব এমনভাবে অর্পণ করেছেন যে, ঐ ক্ষেত্রে তাঁর আর হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, ফলে তারা আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদন করতে পারে।[২] একারণেই শাফায়াত সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ আয়াতে শাফায়াত মহান আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

---

১. কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক ধারণাটি হল যদি কোন কর্ম আল্লাহ কোন মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া স্বীয় ইচ্ছা ও ইরাদায় সরাসরি সৃষ্টি বা সম্পাদন করেন তা যেমন আল্লাহর কর্ম, তেমনি কোন কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যখন তিনি তাঁরই সৃষ্ট কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করেন তাও তাঁরই কর্ম। এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।– অনুবাদক

২. 'কিন্তু মুসলমানরা ফেরেশতাদের তাদের হাতে ঐশীভাবে সমর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সত্তাগতভাবে সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল মনে করে অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া তারা আদৌ কোন কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা রাখে না।– অনুবাদক

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ

তাঁর অনুমতি ছাড়া কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারা : ২৫৫)

একইরূপ পূর্বোল্লিখিত সূরা শুয়ারার ৯২-৯৩ নং আয়াতে (من دون الله هل ينصرونكم) 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে' এবং সূরা আম্বিয়ার ৪৩ নং আয়াতে (من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم) 'আমাদের সাহায্য ব্যতীত কেউ তাদের সাহায্যের ক্ষমতা রাখে না' বলা হয়েছে। সুতরাং ইবাদত হওয়ার আবশ্যক শর্ত হল যার সামনে বিনয়ী ও নত হবে তার ব্যাপারে আল্লাহর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের জীবনের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়সমূহ তার (ঐ উপাস্যের) ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়াতে বিশ্বাস রাখা। কেবল এরূপ বিশ্বাসই কোন কর্মকে ইবাদতে পরিণত করে এবং এর অনুপস্থিতিতে তা ইবাদত বলে পরিগণিত হবে না।[১]

আশা করি এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে পাঠকরা কোন কর্ম ইবাদত হওয়া ও না হওয়ার বিষয়টি যাচাই করতে পারবেন।

অনুবাদ : এ কে এম আনোয়ারুল কবীর

১. অবশ্য সাধারণভাবে কখনও কখনও কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তি, পদ, বস্তু বা কর্মের প্রতি অতি আসক্তির বিষয়টি ব্যক্ত করতে 'পূজা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন ব্যক্তিপূজা, দুনিয়াপূজা, অর্থপূজা, প্রবৃত্তিপূজা, ক্ষমতাপূজা ইত্যাদি পরিভাষাগুলো রূপক অর্থ নির্দেশ করে।

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাওয়াস্‌সুল

এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

একদল লোক মানুষের, এমনকি আল্লাহ্‌র নবি ও ওলীদের ক্ষেত্রেও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী নয়। এ কারণেই তারা মৃত্যুর পর তাঁদের নিকট সাহায্য চাওয়া, তাঁদেরকে মাধ্যম বা উসিলা হিসেবে গ্রহণকে (তাওয়াসসুল) জায়েয মনে করে না; বরং তা এক প্রকার শির্‌ক বলে বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র নবি ও ওলীদের প্রতি (মৃত্যুর পরে) আহ্বানকে পাথরের ন্যায় প্রাণহীন বস্তুর প্রতি আহ্বান মনে করে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌র নবি ও ওলিগণ মৃত্যুর পর বিলীন হয়ে গেছেন এবং এ পৃথিবীর সাথে তাঁদের আর কোন সম্পর্ক নেই। তাই তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়া ও তাঁদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া অর্থহীন কাজ। এ প্রবন্ধে আমরা তাওয়াস্‌সুল কী এবং এর বৈধতা ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেব।

তাওয়াস্‌সূল কী

পারিভষিক অর্থে 'তাওয়াস্‌সুল' হল আল্লাহ্‌র নবি ও ওলীদের জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পর তাঁদের উসিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট চাওয়া। রাগিব ইসফাহানী তাঁর 'মুফরাদাত' গ্রন্থে 'ওয়াসিলা' (وسيله) শব্দের আলোচনায় এর অর্থ 'নিজেকে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সাথে কোন কিছুর নিকট পৌঁছানো' বলেছেন। এ শব্দটি আরবি 'ওয়াছিলা' (وصيله) শব্দের (যার অর্থ পৌঁছানো) থেকে বিশেষায়িত অর্থ নির্দেশ করে। কেননা, 'ওয়াসিলা' শব্দের মধ্যে পৌঁছার সাথে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাও নিহিত রয়েছে। 'ওয়াসিলা' শব্দটি পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদায় এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣٥

'হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য (লাভের মাধ্যম) অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[১]

আল্লাহর ওয়াসিলা বা নৈকট্য লাভের মূল পন্থা হল তাঁর পথের অনুসরণ। প্রথমত, তাঁর নির্দেশ ও বিধানসমূহের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, দ্বিতীয়ত, তাঁর বন্দেগি ও দাসত্ব করা, তৃতীয়ত, শরীয়তে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও তাঁর পছন্দনীয় যে সকল কর্ম বর্ণিত হয়েছে তা পালন করা। এ অর্থে 'ওয়াসিলা' শব্দটি নৈকট্য শব্দের সমার্থক।[২]

যেহেতু 'ওয়াসিলা' (وسيله) শব্দ 'ওয়াছিলা' (وصيله) শব্দের অনুরূপ অর্থাৎ এর মধ্যে পৌঁছানোর বিষয়টি রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ, যিনি স্থান ও দৈহিকতার মত সীমাবদ্ধতার বৈশিষ্ট্যমুক্ত সেহেতু তাঁর নৈকট্য লাভ ও তাঁর কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারটি রূপক ও অবস্তুক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে উবুদিয়াত ও বন্দেগি ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক নেই, সেহেতু 'ওয়াসিলা'র অর্থ হল বান্দা নিজের মধ্যে দাসত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিফলন ঘটাবে এবং তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। সুতরাং রাগেব ইসফাহানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে বান্দার বন্দেগির সম্পর্ক সৃষ্টি। আল্লামা তাবাতাবায়ী এ অর্থকে 'ওয়াসিলা' শব্দের আবশ্যক অর্থ বলে মনে করেন, প্রত্যক্ষ অর্থ নয়। জ্ঞান ও কর্ম, দাসত্ব ও নৈকট্যে পৌঁছার মাধ্যম, তা পৌঁছানো অর্থ দেয় না।[৩]

উপরোল্লিখিত আয়াতে 'জিহাদ'কে– তা শত্রুর সাথে হোক বা নাফ্‌সের সাথে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই জিহাদ নৈকট্যের অন্যতম মাধ্যম এবং আয়াতে এটিকে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবেই শুধু আনা হয়েছে। কিন্তু নৈকট্যের অসংখ্য মাধ্যম রয়েছে। আমরা এখানে তার থেকে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

---

১. সূরা মায়েদাহ : ৩৫
২. আল মুফরাদাত, পৃ. ৫২৩-৫২৪
৩. আল্লামাহ তাবাতাবায়ী, আলমিযান ফি তাফরীরিল কুরআন, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১. মহান আল্লাহর পবিত্র সুন্দর নামসমূহের উসিলা ও মাধ্যমে চাওয়া (তাওয়াস্‌সুল)

তাওয়াস্‌সুল বা উসিলার মাধ্যমে চাওয়ার একটি বড় দৃষ্টান্ত হল আল্লাহর পবিত্র নামের উসিলা দিয়ে তাঁর কাছে চাওয়া। এধরনের চাওয়ার নমূনা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহলে বাইতের থেকে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়ায় প্রচুর দেখা যায়। যেমন ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত 'দোয়ায়ে সামাত' (সামাতের দোয়া– যা শুক্রবারে অপরাহ্নে পড়া হয়)-এ এভাবে তাওয়াস্‌সুল করা হয়েছে :

اللهمّ انّي أسألک باسمک عظيم الاعظم، الأعزّ الأجلّ الاكرم الذى اذا دُعِيتَ به علَى مَغالقَ ابوابِ السماءِ لِلفَتحِ بالرحمةِ اِنفَتَحَت و اذا دُعِيتَ به علَى مضايقَ ابواب الأرضِ لِلفَرَجِ اِنفرجت و اذا دُعِيتَ به علَى العسر لِليُسرِ تيسّرت...

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার মহান ও মহামহিম নামের উসিলা দিয়ে চাইছি, সেই নাম যা সম্মানিত, সর্বোচ্চ ও মহিমান্বিত। এ নামের মাধ্যমে ঊর্ধ্বলোকের বন্ধ দ্বারে আহ্বান জানালে তা আপনার রহমতের কারণে উন্মোচিত হয়। যদি ঐ নামের দ্বারা পৃথিবীর সংকীর্ণ কপাটের সামনে আপনাকে আহ্বান করা হয় তবে তা প্রশস্ত হয়ে খুলে যায়। যদি ঐ নামের মাধ্যমে কষ্টে ও বিপদে মুক্তি ও তা সহজ হওয়ার জন্য আপনাকে আহ্বান করা হয় তবে সবকিছু সহজ হয়ে যায়...।[১]

'দোয়ায়ে জাওশানে কাবির' এরূপ আরেকটি দোয়া যা পবিত্র রমযান মাসের প্রথম রাত্রি ও শবে কদরের রাতগুলোতে পড়া হয় এবং আল্লাহর নিকট তাঁর এক হাজার একক ও সমন্বিত (মৌল ও যৌগ) নাম ও গুণের মাধ্যমে আহ্বান করা ও চাওয়া হয়।

২. পবিত্র কোরআন দ্বারা তাওয়াস্‌সুল

১. শেখ তুসি, মিসবাহুল মুতাহাজ্জেদ, পৃ. ৩৭৪।

আল্লাহর কাছে চাওয়ার অন্যতম উসিলা ও মাধ্যম হল কোরআন। এ কারণেই এ কাজটি হল মুস্তাহাব যে, শবে কদরের রাতে বান্দারা নিজেদের সামনে কোরআন খুলে রেখে এ দোয়াটি পড়বে :

اللّٰهُمَّ انِّىْ أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلْ وَ مَا فِيْهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرَ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى...

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট যে গ্রন্থ আপনি অবতীর্ণ করেছেন এবং যা কিছু তাতে (বর্ণিত) আছে এবং আপনার যে মহান ও সর্বোত্তম নাম এবং সুন্দর নামসমূহ তাতে উল্লিখিত হয়েছে তার উসিলায় আপনার কাছে চাইছি...।[১]

৩. নিজের সৎকর্মের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া

সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়ার বিষয়টি এরকম যে, বান্দা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য যে কাজ করেছে তার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে তার কোন সমস্যা সমাধানের জন্য দোয়া করবে। এমনকি বান্দা যে কোন সৎকর্ম করার পর আল্লাহর কাছে তার বিনিময়ে কোন কিছু চাইতে পারে। এধরনের তাওয়াস্‌সুলের নমুনা হাদিসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

'সহীহ বুখারী'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনজন মুমিন ব্যক্তি একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলে আকস্মিকভাবে একটি বিরাট পাথর তাদের গুহার সামনে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কোনক্রমেই তারা ঐ পাথরটি সরাতে পারল না, দীর্ঘ সময় তাতে আটকে পড়ল। তখন তাদের একজন বলল, আমরা প্রত্যেকে খালেছভাবে আল্লাহর জন্য যে কাজটি করেছি তার উসিলা দিয়ে তাঁর কাছে চাই, অবশ্যই তিনি আমাদের দোয়াকে গ্রহণ করবেন। তাদের প্রথম জন বলল: 'হে আল্লাহ! আমি এক সুন্দরী নারীকে অর্থ দিয়ে সম্ভোগ করতে চাইলে সেও রাজি হয়, কিন্তু আমি আপনার জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে তা থেকে নিবৃত্ত থেকেছি।' এ কথা বলা মাত্রই পাথরটি গুহার মুখ থেকে কিঞ্চিত সরে যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল : 'হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি একদল লোককে শ্রমের জন্য ভাড়া করেছিলাম। তাদের প্রত্যেককে অর্ধেক দিরহাম মজুরি দেব বলে ঠিক করেছিলাম। তাদের একজন দুজনের সমান কাজ করেছে বলে আমার কাছে এক

১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।

দিরহাম পারিশ্রমিক চাইল। আমি তাকে তা না দিয়ে ঐ অর্থের সাথে নিজের শ্রম ও পুঁজি দিয়ে কৃষিকাজ করে দশ হাজার দিরহাম মুনাফা অর্জন করলাম এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য পুরোটাই তাকে দিয়ে দিলাম।' তার কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই গুহার মুখ আরেকটু খুলে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল : 'আমি এক রাতে আমার পিতা ও মাতার জন্য দুই পাত্র দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। একবার ভাবলাম তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খেতে বলি। কিন্তু তাদের কষ্ট হবে ভেবে মন তাতে সম্মতি দিল না। আবার চিন্তা করে দেখলাম, যদি দুধের পাত্র দুটি মাটিতে রেখে আমার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি তবে তা পড়ে যেতে বা তাতে মাছি-মশা পড়তে পারে। তাই সারারাত তাঁদের শিয়রে পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁরা ঘুম থেকে জাগলে তাঁদেরকে দুধ খাইয়ে আমি ঘুমাতে গেলাম।' তৎক্ষণাৎ গুহার সামনে থেকে পাথরটি অপসারিত হয়ে গেল।[১]

৪. নবি করিম (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর উসিলা দিয়ে চাওয়া

মহানবি (সা.) মানবজাতির মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও তাঁর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহান আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।[২] তাঁর বরকতময় উপস্থিতির কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর উম্মতের কাফেরদের ওপর থেকেও ধ্বংসের শাস্তি উঠিয়ে নিয়েছেন।[৩] অথচ আল্লাহ পূর্ববর্তী কোন নবির জন্য তেমন প্রতিশ্রুতি দেন নি। রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য ফজিলত ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যার বিবরণ দান এ প্রবন্ধের মধ্যে আদৌ সম্ভব নয়।

---

১. সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৩, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৫৩ ও কিতাবুল বাঈ, বাব ৯৮; তাবারসী, মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২। বর্ণনাটি কিছুটা শব্দগত পার্থক্যসহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

২. আমরা কেবল তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ প্রেরণ করেছি(সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭)।

৩. কিন্তু আল্লাহ কখনই তাদের শাস্তি দেবেন না এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মধ্যে রয়েছ (সূরা আনফাল : ৩৩)।

মোটকথা, আল্লাহর নিকট রাসূল (সা.)-এর এ মর্যাদাকর অবস্থানের কারণে তিনি তাঁর কোন দোয়াকেই প্রত্যাখ্যান করেন না। আর তাই মুমিনদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হতে। আল্লাহ বলেছেন :

وَلَو أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

(হে রাসূল!) যখন তারা (অবাধ্যতা করে) নিজেদের (আত্মার) প্রতি অবিচার করেছিল, তখন যদি তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময় পেত।[১]

অন্যত্র আল্লাহ মুনাফিকদের তাদের গুনাহের ক্ষমার জন্য তাঁর রহমতের অফুরন্ত এ ধারা অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর থেকে উপকৃত না হওয়া ও তাঁর শরণাপন্ন না হওয়ার সমালোচনা করে বলেছেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ۝ .... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ۝

আর যখন তাদের (মুনাফিক) বলা হয়, 'তোমরা এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন', তখন তারা তাদের মাথাঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদের দেখবে যে, তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।...নিশ্চয়ই আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।'[২]

সুতরাং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য সরাসরি তাঁর কাছে দোয়া করার চেয়ে রাসূলের মাধ্যমে তা করা অধিকতর ফলপ্রসূ। কেননা, মহান আল্লাহই এরূপ

১. সূরা নিসা : ৬৪।
২. সূরা মুনাফিকুন : ৫-৬।

চেয়েছেন। নতুবা তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিতেন না।

৫. অন্যান্য নবির জীবদ্দশায় প্রয়োজন পূরণে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়া

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াত থেকে বোঝা যায়, অন্যান্য নবির উম্মতও আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তি, এমনকি মানুষের পক্ষে বস্তুগত যে সকল প্রয়োজন সাধারণভাবে পূরণ করা সম্ভব নয় সেগুলো তাঁদের মাধ্যমে চাইত অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে গণ্য ছিলেন। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি যখন তাদের সফরে পানিশূন্য ও তৃণহীন কোন প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মুখোমুখি তো তখন তাঁর নিকট খাদ্য ও পানি চাইত। মহান আল্লাহ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন :

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنۢبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَـٰمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ

এবং মূসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি প্রার্থনা করল, আমরা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম যে, 'তুমি তোমার ছড়ি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' তখন (পাথরে আঘাত করতেই) তা থেকে (এরূপে) বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হলো (যে), প্রত্যেক দল তাদের স্ব স্ব ঘাট চিনে নিল। এবং আমরা তাদের ওপর মেঘ দ্বারা ছায়া করেছিলাম। তাদের (ক্ষুধা নিবৃত্তির) জন্য 'মান্না' (মধুজাতীয় খাদ্য) ও 'সালওয়া' (কোয়েলজাতীয় পাখি) অবতীর্ণ করেছিলাম।[১]

এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট খাদ্য ও পানীয় চাওয়াকে আল্লাহ আদৌ সমালোচনা করেন নি; বরং তাঁর জাতির জন্য এটাই উপযুক্ত মনে করেছেন যে, তাঁর

১. সূরা আ'রাফ : ১৬০।

মাধ্যমেই তারা তাদের জীবিকা লাভ করুক। আর এটা এ কারণে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট খুবই সম্মানিত ছিলেন।[১]

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানরা যখন তাদের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচিত হয়েছিল তখন তারা তাদের পিতার কাছে গিয়ে বলে :

قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوۡفَ أَسۡتَغۡفِرُ لَكُمۡ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

তারা (ইয়াকুবের সন্তানরা) বলল, 'হে আমাদের পিতা! তুমি আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আমরা পাপী ছিলাম।' সে (ইয়াকুব) বলল, 'অতি সত্বর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।'[২]

এ ঘটনাতেও আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর নবি ইয়াকূব (আ.) তাঁর সন্তানদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট মধ্যস্থতাকারী হয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর সময়ও অসুস্থ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন এবং তিনিও তাঁর বরকতময় হাতের স্পর্শে তাদের রোগ সারাতেন। পবিত্র কোরআন ঈসা (আ.)-এর ভাষায় বর্ণনা করছে :

وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأۡكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٤٩﴾

আমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে জন্মান্ধকে ও শ্বেতীরোগীকে আরোগ্য দান করি এবং আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষে মৃতকে জীবিত করি, আর তোমরা যা খাও এবং নিজেদের গৃহে সঞ্চয় করে থাক, আমি (সবই) তোমাদের বলে দেই। নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাদের জন্য (আমার নবুওয়াতের) বড় নিদর্শন আছে; যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক।[৩]

১. সে (মূসা) আল্লাহর নিকট সম্মানিত ছিল (সূরা আহযাব : ৬৯)।
২. সূরা ইউসূফ : ৯৭-৯৮।
৩. সূরা আলে ইমরান : ৪৯।

অতএব, নবিদের জীবদ্দশায় তাঁদের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করা যে বৈধ ও অনুমোদিত বিষয়, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এখন যে বিষয়টি বাকি থাকে তা হলো তাঁদের মৃত্যুর পরও কি তাঁদের কাছে ও তাঁদের মাধ্যমে চাওয়া সঠিক?

৬. মহানবি (সা.) এর মৃত্যুর পর তাঁর উসিলায় চাওয়া

এ প্রশ্নটি স্বাভাবিক যে, রাসূলের মৃত্যুর পরও কি তাঁর উম্মতের জন্য তাঁর উসিলা দিয়ে চাওয়ার অনুমতি রয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য মৃত্যুর পরও নবিদের জীবনের অব্যাহততার বিষয়টি আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার পরও জীবনের অব্যাহত থাকা

পবিত্র কোরআনের আয়াত হতে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষের মৃত্যু তার জীবনের শেষ নয়; বরং সে অন্য এক জীবনে প্রবেশ করে ও স্থানান্তরিত হয়। মানুষ মৃত্যুর পর বস্তুগত জগতের ঊর্ধ্বে এক নতুন জগতে অধিকতর বিস্তৃত জীবন লাভ করে। যেমন:

ক. মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় প্রাণকে পূর্ণরূপে হরণ করেন এবং (তার প্রাণকে) যে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে ও মৃত্যুবরণ করে নি। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত হয়েছে তার প্রাণকে আবদ্ধ রাখেন এবং অন্যদেরকে (প্রাণ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি (আল্লাহ্র ক্ষমতার) রয়েছে।[১]

১. সূরা যুমার : ৪২

খ. অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত ভেব না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকাপ্রাপ্ত।'[১]

অন্য একটি আয়াত হতে জানা যায়, এই বিশেষ জীবন (বারজাখের জীবন) শুধু শহীদদের জন্যই নয়; বরং আল্লাহ্‌র সকল অনুগত ও সৎকর্মশীল বান্দার জন্য নির্ধারিত।

মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন :

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য করবে তারা সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে– নবিগণ, সত্যবাদিগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য হতে যাদের তিনি নিয়ামত দিয়েছেন। তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!'[২]

যদি শহীদগণ আল্লাহ্‌র নিকট জীবিত থাকেন ও জীবিকা লাভ করেন তবে যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে–যেহেতু রাসূল নিজেও তাঁর আনীত নির্দেশের আনুগত্যকারী, সেহেতু তিনিও এর অন্তর্ভুক্ত–সেও শহীদদের সাথে থাকবে, কারণ, উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকারী শহীদদের সঙ্গে থাকবে বলা হয়েছে। যদি শহীদরা মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র নিকট জীবিত থাকেন তবে তারাও আল্লাহ্‌র নিকট জীবিত রয়েছে ও বারজাখী জীবনের অধিকারী।

মুমিন ব্যক্তিরাও মৃত্যুর সাথে সাথে কবরের বেহেশতে প্রবেশ করে যেমনটি আল্লাহ বলেছেন :

১. সূরা আলে ইমরান : ১৬৯
২. সূরা নিসা : ৬৯

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

যাদেরকে ফেরেশতারা এমন অবস্থায় পূর্ণরূপে গ্রহণ (প্রাণহরণ) করে যে, তারা পবিত্র থাকে, (এবং) তারা (ফেরেশতারা) বলে, 'সালামুন আলাইকুম' (তোমাদের প্রতি শান্তি); 'তোমাদের কর্মের সুবাদে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।'[১]

কাফেররাও মৃত্যুর পর পরই কবরের জাহান্নামে প্রবেশ করে থাকে। কোরআন নূহ (আ.)-এর জাতি সম্পর্কে বলছে :

مِّمَّا خَطِيٓـَٰٔتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾

(নূহের জাতিকে) তাদের অপরাধের জন্য নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করানো হল; অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকেও সাহায্যকারী পায় নি।[২]

পবিত্র কোরআনে ফিরআউন ও তার অনুসারীদের কবরে আজাব হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

এবং ফিরআউন-সম্প্রদায়কে নিকৃষ্টতম শাস্তি পরিবেষ্টন করল। সেই অগ্নি, যার সম্মুখে তাদেরকে প্রতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন (ফেরেশতাদের) আদেশ দেওয়া হবে, 'ফিরআউন-সম্প্রদায়কে কঠোরতম শাস্তির স্থানে নিক্ষেপ কর।'[৩]

১. সূরা নাহ্‌ল : ৩২।
২. সূরা নূহ : ২৫।
৩. সূরা মুমিন : ৪৫-৪৬

আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই ফিরআউন-সম্প্রদায়কে আগুনের শাস্তি প্রদানের বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে যা তাদের কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে।

পৃথিবীর জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবনের মধ্যে সংযোগ

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ ও হাদিস হতে জানা যায় যে, পৃথিবীর অধিবাসী জীবিত মানুষ ও কবরবাসী মৃত মানুষের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে এ অর্থে যে, যখন কোন জীবিত মানুষ তাদেরকে ডাকে ও সম্বোধন করে কিছু বলে অথবা চায় তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে তার উত্তর দিয়ে থাকে। এখানে আমরা এ সম্পর্কিত কিছু আয়াত ও হাদিসের প্রতি ইশারা করছি।

ক. আয়াতসমূহ

মহান আল্লাহ্ হযরত সালিহ (আ.)-এর জাতির মৃতদের সম্বোধন করে তাঁর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন :

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٧٩﴾

অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (সালিহ) তাদের (মৃতদেহগুলো) হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও বললেন : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ও বাণী পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি, কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাস না।'[১]

২. হযরত শুয়াইব (আ.)-এর উম্মত সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

৩. অন্যত্র বলা হয়েছে :

---

১. সূরা আরাফ : ৭৮-৭৯।

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

'আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, পরম করুণাময় (আল্লাহ্) ছাড়া কি অন্য কোন উপাস্য আমি ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম।' '[১]

আলোচ্য আয়াতে শির্কের বিষয়টি অসত্য প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন এবিষয়ে পূর্ববর্তী নবিদের প্রশ্ন করেন। যদি একথা সঠিক হয় যে, মৃতরা কোন কথা শুনতে পায় না, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যেহেতু পূর্ববর্তী নবিরা সকলে মৃত্যুবরণ করেছেন সেহেতু তাঁরা রাসূলের প্রশ্নটি শুনতে পারবেন না ও এর উত্তরও দিতে সক্ষম হবেন না। সেক্ষেত্রে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তবে কি আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনর্থক ও অকার্যকর একটি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রজ্ঞাময় ও ত্রুটিহীন পবিত্র সত্তা আল্লাহ এরূপ অযথা কর্ম হতে উর্ধ্বে। কখনই তিনি লক্ষ্যহীন কর্ম করেন না। (সূরা আলে ইমরান : ১৯১, সূরা দুখান : ৩৮ ও সূরা আম্বিয়া : ১৬)। তাই নিশ্চিত বলা যায়, নবিগণ তাঁদের মৃত্যুর পরও জীবিত থাকেন ও অন্য মানুষের কথা শুনে জবাব দিতে পারেন। একারণেই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এরূপ প্রশ্নের নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. অন্যত্র কয়েকটি আয়াতে বিভিন্ন নবির ওপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে বলেছেন:

سَلَـٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٧٩﴾

'বিশ্ববাসীদের মধ্যে নূহের উপর সালাম।'[২]

سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾

'ইবরাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[৩]

১. সূরা যুখরুফ : ৪৫।
২. সূরা সাফফাত : ৭৯।
৩. সূরা সাফফাত : ১০৯।

سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٠﴾

'মূসা ও হারুনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[১]

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾

'ইল ইয়াসিনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[২]

وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾

নবিগণের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।[৩]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ হতে বোঝা যায়, পৃথিবীর জীবন ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে এবং কবরে মানুষ ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের কথোপকথন শুনতে পায় ও তাদের সালামের জবাব দেয়।

শেখ মাহমুদ শালতুত বলেছেন, 'কোরআন ও হাদিস হতে জানা যায়, যখন মানুষের দেহ হতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয় তখন সে মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু তখনও তার অনুধাবন ক্ষমতা থাকে (ও অন্যরূপ জীবন নিয়ে সে বেঁচে থাকে) এবং তাকে কেউ সালাম দিলে সে তা শুনতে পায়, তার কবর যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে ও কবরে বেহেশ্‌তী নিয়ামত ও দোযখের আজাব অনুভব করে।[৪]

শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম তাঁর ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তি তার যিয়ারতকারীকে (সাক্ষাৎকারী জীবিত ব্যক্তিকে) চিনতে পারে । কারণ, শরীয়ত আমাদের নির্দেশ দিয়েছে মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার এবং শরীয়তের প্রবক্তা কখনোই এমন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নির্দেশ দেন নি যে শুনতে পায় না।'[৫]

১. সূরা সাফফাত : ১২০।
২. সূরা সাফফাত : ১৩০।
৩. সূরা সাফফাত : ১৮১।
৪. শালাতুত, আল ফাতাওয়া, পৃ. ১৯।
৫. শাইখুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামের ফতোয়াসমগ্র, পৃ. ৩১

খ. হাদিসসমূহ

১. মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি মুমিন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি পৃথিবীতে ঐ মৃত ব্যক্তির পরিচিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে মহান আল্লাহ্ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তার সালাম ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জবাব দানের জন্য সজাগ করেন।'[১]

২. মহানবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের পদধ্বনি শুনতে পায়।[২]

৩. ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া তাঁর 'আররুহ' গ্রন্থে বলেছেন, 'সাহাবিগণ ও প্রাচীন আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি তার যিয়ারতকারী ব্যক্তিকে চিনতে পারে এবং তার আগমনে আনন্দিত হয়।[৩]

৪. ইবনে আবিদ দুনিয়া তাঁর 'আল কুবুর' গ্রন্থে হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবি বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে যিয়ারত করে অর্থাৎ তার কররের নিকটে যায় ও সেখানে বসে, তবে মৃত ব্যক্তি তার সাহচর্যে আনন্দিত হয় ও তার সালামের উত্তর দেয়; ততক্ষণ তার সাহচর্য অনুভব করে যতক্ষণ না সে সেখান হতে উঠে চলে যায়।[৪]

৫. আবু হুরাইরা মহানবি (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মৃতের কবরের পাশ দিয়ে যায় ও তাকে সালাম দেয় তখন মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে ও তার সালামের জবাব দান করে।[৫]

৬. বায়হাকী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর সঙ্গে মদীনায় কবরস্থানে পৌঁছলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন : 'হে কবরবাসী! তোমাদের ওপর আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের সংবাদ আমাদের জানাও, নতুবা আমাদের খবর

১. ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া, আররুহ, পৃ. ৯।
২. ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া, আররুহ, পৃ. ৯।
৩. আররুহ, পৃ. ৯।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. ফাইজুল ক্বাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭।

শোন।' সাঈদ বলেন : তখন তাদের কণ্ঠ শুনতে পেলাম : ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া আমীরাল মুমিনীন! আমাদেরকে আপনাদের সংবাদ জানান। হযরত আলী (আ.) বললেন : 'তোমাদের স্ত্রীরা অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে, তোমাদের সম্পদ উত্তরসূরিদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। তোমাদের সন্তানরা ইয়াতীমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তোমাদের নির্মিত গৃহগুলোতে তোমাদের শত্রুরা বাস করছে। আমাদের নিকট এই হলো খবর। তোমাদের কী খবর?' সাঈদ বলেন : 'এক মৃত ব্যক্তি বলল যে, তার কাফনের কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তার চুলগুলো ঝরে পড়েছে, চর্ম দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, চক্ষু অক্ষিকোটর হতে বেরিয়ে মুখের উপর ঝুলে পড়েছে, নাকের ছিদ্র হতে গলিত রস বেরিয়ে আসছে। যা এখানকার জন্য প্রেরণ করেছিলাম তা পেয়েছি এবং করণীয় যা করি নি তার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।'[১]

ইবনে কাইয়্যেম জাওযীয়া মৃত ব্যক্তিরা জীবিত ব্যক্তি কর্তৃক তার কবর যিয়ারতকে অনুভব করতে পারে কিনা প্রসঙ্গে বলেন, 'মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারতকারীকে 'জায়ের' (সাক্ষাৎকারী) বলা হয়, এর অর্থ মৃত ব্যক্তি তার সাক্ষাৎকারীকে চিনে। নতুবা তাকে 'জায়ের' বলা হতো না।'[২]

৭. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরের ভেতর শোয়ানো হয়, তখন সে তাকে দাফন করতে আসা ব্যক্তিদের পদধ্বনি শুনতে পায়।'[৩]

৮. আবু হুরাইরা বলেছেন, 'মহানবী (সা.) যখনই কবর যিয়ারতে যেতেন এরূপে কবরবাসীদের সম্বোধন করতেন[৪],

السلام عليكم اهل الديار من المومنين و المسلمين و انا ان شاءالله بكم لاحقون
اسال الله لنا ولكم العافية

১. মূসা মুহাম্মদ আলী, হাকীকাতু তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওয়াসিলাহ, পৃ. ২৪২
২. আররূহ, পৃ. ৮।
৩. ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।
৪. তালখিসুল হাবির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

'হে এই গৃহের (কবর) অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানরা, তোমাদের ওপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য (সকল অনিষ্ট থেকে) মুক্তি কামনা করছি।'

৯. ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'এক সাহাবী একটি কবরের নিকট তাঁবু পাতলেন, কিন্তু জানতেন না সেটি একটি মৃত ব্যক্তির কবর। হঠাৎ করে তাঁর কানে 'সূরা মুল্‌ক' তেলাওয়াতের শব্দ আসল। সূরা পাঠ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা তাঁর কানে ভেসে আসছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি রাসূল (সা.)-এর নিকট পৌঁছে ঘটনাটি খুলে বললেন। মহানবী বললেন, 'সূরা মুল্‌ক কবরের আযাবের প্রতিরোধক এবং মানুষকে কবরের আযাব হতে মুক্তি দেয়।'[১]

কবরে বা বারজাখে নবিগণের জীবন

নবিগণের বারজাখী জীবন সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত কয়েকটি হাদিস

১. আনাস ইবনে মালিক মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, 'নবিগণ তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন এবং নামায পড়েন।' এই হাদীসটি হাফিজ হাইসামী তাঁর 'মাজমায়ুজ জাওয়ায়িদ'[২] গ্রন্থে এবং আল্লামা মানাভী তাঁর 'ফাইজুল ক্বাদীর'[৩] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী[৪] হাদীসটির বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

২. মহানবী (সা.) বলেছেন : 'মৃত্যুর পর আমার অবগতি আমার জীবিতাবস্থার ন্যায়।'[৫]

১. সহীহ তিরমিযী, 'কিতাবে ফাজায়িলুল কুরআন।
২. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১১।
৩. ফাইজুল ক্বাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪।
৪. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সাহীহাহ, হাদীস নং ৬২১।
৫. কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৭, হাদিস নং ২২৪২।

৩. হযরত আলী (আ.) বর্ণনা করেছেন : "এক বছর এক আরব বেদুইন রাসূলের কবরের নিকট এসে বলল : 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' কবরের ভেতর হতে জবাব এল : 'আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করেছেন'।"[১]

৪. দারেমী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে আবদুল আজিজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল (সা.)-এর কবরের মধ্য হতে যিক্‌রের শব্দ শুনে নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে বুঝতে পারতেন।[২]

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব হতে দারেমী বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মদীনার হত্যা ও লুণ্ঠনের দিনগুলোতে তিনি মহানবীর কবর হতে আযান শুনেছেন, আর মসজিদ তখন লোকশূন্য ছিল।[৩]

৫. হাফিজ হাইসামী সহীহ সূত্রে আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন : 'সেই সত্তার কসম! আবুল কাসেম মুহাম্মাদের জীবন যাঁর হাতে নিবদ্ধ, ঈসা ইবনে মারইয়াম ন্যায়বিচারক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন। তিনি ক্রুশসমূহ নিশ্চিহ্ন করবেন, শুকরসমূহ হত্যা করবেন, সকল কিছুর সংস্কার সাধন করবেন, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতার অবসান ঘটাবেন, প্রচুর সম্পদ দান করবেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার কবরে এসে আমাকে সম্বোধন করে জবাব না পাবেন, ততক্ষণ তাঁকে কেউ গ্রহণ করবে না।'[৪]

৬. হাফিজ হাইসামী সহীহ হাদিস সূত্রে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন : 'আমার জীবিতাবস্থা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এ জন্য যে, আমার নিকট হতে হাদীস শোন ও বর্ণনা কর। আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর এ কারণে যে, তোমাদের কর্মসমূহ (আমলনামা) আমার কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং আমি তোমাদের সৎকর্ম দেখে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করব এবং তোমাদের মন্দকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব।'[৫]

---

১. প্রাগুক্ত।
২. সুনানে দারেমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭, হাদিস নং ৯৩।
৩. মূসা, মুহাম্মাদ আলী, হাকীকাতুত তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওয়াসিলাহ, পৃ. ২৭১।
৪. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১১।
৫. প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪; সুয়ূতী, আল খাসাইসুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮১।

ইউসুফ ইবনে আলী জানানী মদীনাবাসী হাশেমী বংশের এক নারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদের কোন কোন খাদেম তাকে জ্বালাতন করত। তিনি মহানবীর সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁর পবিত্র কবর হতে শুনতে পেলেন : 'আমি ধৈর্যের ক্ষেত্রে তোমার আদর্শ। তাই ধৈর্যধারণ কর।' কয়েকদিন পর আপনা আপনিই সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল এভাবে যে, তারা সকলেই মারা গেল।[১]

একটি সন্দেহের জবাব

পবিত্র কোরআনের কোন কোন আয়াত হতে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, মৃতরা শুনতে পায় না। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

সুতরাং নিশ্চয়ই (হে নবি!) তুমি মৃতদের (যাদের অন্তর মৃত) শোনাতে সক্ষম নও এবং বধিরদের কর্ণেও তা পৌঁছাতে সক্ষম নও যখন তারা (নিজেরাই) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।[২]

অন্য আয়াতে এসেছে :

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

'অবশ্যই জীবিত ও মৃত সমান নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে চান শোনান। তুমি যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে শোনাতে সক্ষম নও।'[৩]

তবে এ আয়াত দুটি কখনই মৃতরা শুনতে পায় না এ বিষয়টি প্রমাণ করে না। কেননা, প্রথমত উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের লক্ষ্য কবরে শায়িত প্রাণহীন দেহ যা মাটিতে পরিণত হয়েছে নয়; বরং যে ব্যক্তি নিজেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যেমনটি প্রথম

১. সুয়ূতী, আলহাভী লিল ফাতওয়া।
২. সূরা রুম : ৫৩।
৩. সূরা ফাতির : ২২।

আয়াতে বলা হয়েছে অর্থাৎ যেহেতু তারা শুনতে আগ্রহী নয় সেহেতু শুনেও না শোনার ভান করে।

দ্বিতীয় আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলো থেকেও এ ব্যাখ্যার সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এ আয়াতগুলোতে কাফের ও মুমিন ব্যক্তির উপমা দেয়ার পূর্বে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفۡسِهِۦۚ

তুমি কেবল তাদেরই সতর্ক করতে পার যারা সংগোপনেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর যে কেউ পবিত্রতা অবলম্বন করবে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করবে।[১]

অর্থাৎ মুমিন ও কাফের উভয়ে আল্লাহর রাসূলের আহ্বান শুনতে পায়, কিন্তু কাফেররা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের বাণী শোনার পরও তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে মুমিনকে জীবিতের সাথে এবং কাফেরকে মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, মুমিনরা কোন কিছু শোনার পর তা অনুসরণ ও পালন করে অর্থাৎ শোনার উদ্দেশ্যটি তাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। এর বিপরীতে মৃতদের শোনার বিষয়টিকে এ দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, তারা মৃতদের মত কোন কিছু শুনলেও তার উত্তর দিতে পারে না ও তাদের পক্ষে ঐ নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে একারণে যে, আল্লাহকে অস্বীকারের কারণে তাদের হৃদয় মারা গেছে। তাই রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : তুমি যেমন মৃতকে শোনানোর ক্ষমতা রাখ না তেমনি কাফেরদের মৃত হৃদয়কে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তোমার নেই। কারণ, তারা কখনই হেদায়াত গ্রহণ করবে না, এক্ষেত্রে তারা কবরে শায়িতদের মত যাদের ওপর তোমার কথার কোন কার্যকর প্রভাব নেই। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য হল মৃত ব্যক্তিদের জন্য যেমন হেদায়াতের আহ্বান ফলপ্রসূ নয় কাফেরদের জন্যও তেমনি রাসূলের দাওয়াত অফলপ্রসূ।

---

১. সূরা ফাতির : ১৮

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নিজেই বলছেন, তিনি চাইলে (জীবিত ও মৃত) সকলকে শোনাতে পারেন। এর বিপরীত অর্থ হল তিনি না চাইলে কেউই–জীবিত হোক বা মৃত–কাউকেই শোনাতে পারবে না। অর্থাৎ শোনানো ও না শোনানোর কাজটি স্বাধীন ও শর্তহীনভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল বিধায় তিনি না চাইলে কেউই, এমনকি স্বয়ং রাসূলও তা শোনাতে সক্ষম নন। সুতরাং কবরে শায়িতদের না শোনার বিষয়টি তাদের সত্তাগত অক্ষমতাকে নির্দেশ করে না; বরং তা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে। আয়াতটি এ ক্ষেত্রে «وما رميت إذ رميت و لكن الله رمى» আয়াতের অর্থের ন্যায় যেখানে রাসূলের তীর নিক্ষেপকে আল্লাহর নিক্ষেপের শর্তাধীন করা হয়েছে অর্থাৎ তীর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি রাসূলের পূর্ণ মুখাপেক্ষিতার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, 'শুনতে সক্ষম নয়' অর্থ কোন কল্যাণ অর্জনে সক্ষম নয়। ফলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় : এই মুশরিক পৌত্তলিকরা কোরআনের আয়াত শোনে, কিন্তু তা হতে কোন কল্যাণ লাভ করে না, যেমন কবরে শায়িতরা তোমার কথা শোনে, কিন্তু কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, তাদের সময় (কল্যাণ লাভের সুযোগ) শেষ হয়ে গেছে।

মূল কথা হল, কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিদের দেহ পচে গেলেও তাদের আত্মা জীবিত বিধায় শ্রবণশীল, কিন্তু তাদের দ্বারা কোন কর্ম সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়।

ইবনে কাইয়্যেম জাওযিয়া وما أنتَ بِمُسمعٍ من فى القبور আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন : আয়াতটির লক্ষ্য সে সকল কাফের যাদের অন্তর মৃত, ফলে (হে নবী!) তুমি তাদের কর্ণে সত্যকে পৌঁছাতে সক্ষম নও যা হতে তারা লাভবান হতে পারে। যেমন কবরে শায়িতদের এমনভাবে শোনাতে সক্ষম নও যা হতে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

ইবনে কাইয়্যেম এ إنّكَ لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين আয়াতের তাফসীরে বলেছেন : 'তাদের শ্রবণের অক্ষমতা এ অর্থে যে, যেহেতু মুশরিকদের অন্তর মৃত সেহেতু তুমি সত্যকে তাদের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম নও, যেমনটি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।'[১]

১. আর রুহ, পৃ. ৪৫-৪৬।

হাসান ইবনে আলী সাক্কাফ আশশাফেয়ী وما أنت بمسمعٍ من فى القبور আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন : 'আয়াতটির লক্ষ্য সে সকল কাফের যারা বাতিলের পথে একগুঁয়েমি প্রদর্শন করে। ফলে তোমার উপদেশ হতে লাভবান হয় না, যেমন কবরে শায়িতরা তোমার উপদেশ হতে কল্যাণ পায় না।' অতঃপর তিনি 'তাফসীরে সাবুনী' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটির অর্থ হলো যেমনভাবে মৃত কাফিররা তোমার হেদায়াত ও আহ্বান হতে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না, দুর্ভাগা মুশরিকরাও তেমনি তোমার সৎপথ প্রদর্শন হতে লাভবান হয় না।[১]

إنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء

আয়াতটির তাফসীরে তিনি বলেছেন : 'এর অর্থ, হে নবী! যার অন্তরে বাতিলের মোহর অঙ্কিত হয়েছে তার নিকট তুমি সত্য পৌঁছাতে সক্ষম নও। কারণ, তারা নিজেরাই সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।'[২]

জড় ও প্রাণহীন বস্তু থেকে বরকত লাভ

মহান আল্লাহ অনেক প্রাণহীন ও জড় পদার্থের মধ্যেও প্রশান্তি ও বরকত রেখেছেন। পবিত্র কোরআন এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে। কখনও কখনও নির্জীব বস্তু-সামগ্রী কোন নবি, তাঁর সন্তান ও বংশধরদের দৈহিক সংস্পর্শে থাকার ফলে বরকতপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষের রোগ-মুক্তি, সাহসবৃদ্ধি ও মানসিক প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে। এর উত্তম দৃষ্টান্ত হলো হযরত ইউসূফ (আ.)-এর জামা যা তাঁরই পিতা, অন্য এক মহান নবির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এ ঘটনা নিম্নোক্ত দুটি আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ... فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا

১. মুখতাছারু তাফসীরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
২. আল ইস্তিগাসা।

আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রাখ; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, ...এবং তার মুখমণ্ডলের ওপর জামাটি রাখল তখন সে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।[১]

আল্লাহর নবি ইয়াকূব নিজেই তাঁর চক্ষুর আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন তিনি তাঁর সন্তান হযরত ইউসূফের জামার উসিলায় আরোগ্য লাভ করুন।

এরূপ আরেকটি বরকতময় বস্তু যা বনি ইসরাঈলের জন্য প্রশান্তিদায়ক ও সাহসসঞ্চারক উপাদান হিসেবে মহান আল্লাহ দিয়েছিলেন। আর তা হলো হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর ভাই নবি হারুন (আ.)-এর বংশধরদের রেখে যাওয়া ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী যা একটি সিন্দুকের মধ্যে ছিল। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলছেন :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

এবং তাদের নবী তাদেরকে বলল, 'তার (আল্লাহর পক্ষ হতে) বাদশা হওয়ার নিদর্শন হলো, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশান্তি এবং সেসব (বরকতময়) বস্তু (রয়েছে) যা মূসা ও হারুনের বংশধররা অবশিষ্ট রূপে রেখে গেছে; এবং ফেরেশতারা তা (সিন্দুকটি) বহন করবে।' যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক তবে নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[২]

এ আয়াতটিতে আল্লাহ এমন এক সিন্দুকের কথা বলেছেন যা এতটা মর্যাদাকর যে, ফেরেশতারা তা বহন করে আনবেন এবং তার মধ্যে যে বরকত রয়েছে তা দুই নবি মূসা ও হারুন (আ.)-এর বংশধরদের ব্যবহৃত সামগ্রীর কারণে। আল্লাহ এ দুই মহান নবির শুধু নয়, এমনকি তাঁদের বংশধরদের রেখে যাওয়া বস্তুগুলোকেও বরকতময় করে দিয়েছেন। মূল্যবান এ সিন্দুকে হযরত মূসা (আ.)-এর ছড়ি ও তাওরাতের দু'টি ফলক, আসমানি তুরাঞ্জবীন (মান্না বা মধুজাতীয় ঐশী খাদ্য), হযরত হারুনের

১. সূরা ইউসূফ : ৯৩ ও ৯৬।
২. সূরা বাকারা : ২৪৮।

পাগড়ি, জুতা প্রভৃতি ছিল। জালুত তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সিন্দুকটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। এ সিন্দুকের নাম 'তাবুত-ই-সাকীনাহ' (প্রশান্তির সিন্দুক)। এ নামকরণের পেছনে কারণ হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বরকত দেয়া হয়েছিল যে, বনি ইসরাঈলের যে কেউ তার সংস্পর্শে প্রশান্তি লাভ করত। তাই তারা বরকতময় এ সিন্দুককে যুদ্ধের সময় সম্মুখে রাখত যা তাদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করত।

এখানেও আমরা দেখি, আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে তাঁর বান্দাদের মনে প্রশান্তি দান না করে একটি সিন্দুককে তাদের প্রশান্তির উসিলা করেছেন। সুতরাং জড় বস্তুও আল্লাহর নবি ও প্রিয় বান্দাদের সংস্পর্শে অলৌকিক কল্যাণ দান করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁদের ব্যবহৃত সামগ্রী, শয়নকক্ষ ও কবর– যেগুলোতে তাঁদের দেহের স্পর্শ লেগেছে তা অন্য সকল সাধারণ বস্তুর মতো নয়।

আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ডাকা কি অবৈধ?

কিছু কিছু আয়াতে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোর ভিত্তিতে অনেকে বলেন যে, তাওয়াস্‌সুলের বিষয়টি যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা এবং অন্যের সাহায্য চাওয়া ও তার শরণাপন্ন হওয়ার শামিল সেহেতু তা অবৈধ। যুক্তি হিসেবে তাঁরা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর উল্লেখ করে থাকেন :

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

'নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ডেক না।'[১]

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ

আর আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভালো বা মন্দ করতে পারে না।[১]

১. সূরা জ্বিন : ১৮।

«ایّاک نعبد و ایّاک نستعین» অর্থাৎ 'আমরা কেবল আপনার ইবাদত করি ও কেবল আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

কিন্তু এ আয়াতগুলোর কোনটিই তাওয়াস্সুলের পরিপন্থী নয়। কেননা, আমরা পূর্বে যে আয়াতগুলোতে নবিদের সন্তান ও তাঁদের উম্মত কর্তৃক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং পার্থিব প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য নবিদের শরণাপন্ন হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছি তা প্রমাণ করে আলোচ্য আয়াতগুলোতে সাহায্যের জন্য ডাকা ও আহ্বান করা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা এখানে আরো কিছু যুক্তির অবতারণা করছি।

উপরিউক্ত সন্দেহগুলোর জবাব

কোরআন মজীদে «دعوت» শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে আহ্বান করে বলেছেন :

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝

'সে (নূহ) বলল : হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি (আহ্বান করেছি)।'[২]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।'[১]

১. সূরা ইউনুস : ১০৬।
২. সূরা নূহ : ৫।

এ আয়াতের প্রথমাংশে (তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব) মানুষকে আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হলেও দ্বিতীয় অংশে 'আমাকে ডাকার ক্ষেত্রে অহংকার করে'– এ কথা না বলে বলা হয়েছে : 'যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে', যা থেকে বোঝা যায়, প্রথমাংশে যে কোন ডাকা ও আহ্বান করা অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা বিশেষ (যেমন কোন সত্তার প্রতিপালক হওয়া বা আল্লাহর সাহায্য ও অনুমতি ছাড়াই সে কিছু করতে পারে এরূপ) বিশ্বাসে ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা। অন্য আয়াতে এ দাবির পক্ষে সমর্থন রয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতটি :

وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا۟ أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾

'অথচ আমি তাদের প্রতি যুলুম করি নি; বরং তারা নিজেরাই নিজের ওপর অবিচার করেছে। ফলে যখন আপনার পালনকর্তার হুকুম এসে পড়ল, তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব উপাস্যকে ডাকত, তাদের কোনো কাজে আসল না... ।"[২]

অতএব, উপরিউক্ত আয়াত দুটিতে 'দাওয়াত' শব্দটি বিশেষ বিশ্বাসসহ আহ্বান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।'

'নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ডেক না।'-আয়াতটিতেও দুটি অংশ রয়েছে যা পরস্পর সম্পর্কিত। আয়াতটির প্রথমাংশের (নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর [ইবাদতের] জন্য) সাথে দ্বিতীয়াংশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এবং সম্পর্কটি হলো প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করছে অর্থাৎ বলছে যে, যেহেতু মসজিদ হলো ইবাদতের স্থান এবং ইবাদতের বিষয়টি আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট, সেহেতু ইবাদতের উদ্দেশ্যে কখনই আল্লাহর পাশাপাশি কাউকে ডেক না।[৩]

---

১. সূরা গাফির : ৬০।
২. সূরা হূদ : ১০১।
৩. আল্লামা তাবাতাবায়ী, আলমিজান ফি তাফসীরিল কোরআন, উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

'মসজিদ' শব্দটিও আলোচ্য আয়াতে 'ডাকা' শব্দটির অর্থ কী তা নির্দেশ করছে এভাবে যে, নামায বা নামাযের বাইরে ইবাদতের সর্বোচ্চ ও স্পষ্টতম প্রকাশ সিজদার মাধ্যমে ঘটে। এমনকি বলা যায়, নামাযের মূল হলো সিজদা।[১] সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ডেক না, কেননা, ইবাদত ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদার বিষয়টি কেবল আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।

সূরা হূদের 'অথচ আমি তাদের প্রতি যুলুম করি নি; বরং তারা নিজেরাই নিজের ওপর অবিচার করেছে। ফলে যখন আপনার পালনকর্তার (শাস্তির) হুকুম এসে পড়ল, তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব উপাস্যকে ডাকত তাদের কোনো কাজে আসল না...'– আয়াতটিও এ দাবিকে সত্য প্রমাণ করে। যেহেতু এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুশরিররকা তাদের উপাস্য হিসেবে ডাকত।

« ايّاك نعبد و ايّاك نستعين » - আয়াতটিও কখনই অপর ব্যক্তি থেকে সাহায্য কামনা ও গ্রহণের পরিপন্থী নয়। পবিত্র কোরআনের যুক্তি উপস্থাপন ও বক্তব্যের ধারার সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, কোরআনে অসংখ্য আয়াতে একটি কাজ একই সাথে আল্লাহ ও আল্লাহর বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত ও উভয়ের ওপর আরোপ করা হয়েছে। যেমন মুত্যুদান ও প্রাণ হরণের কাজটি একই সাথে আল্লাহর ও ফেরেশতাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে।[২] এমনকি বিশ্বজগতের পরিচালনার মতো সবচেয়ে বড়, কঠিন ও ব্যাপক কাজও আল্লাহ একই সাথে নিজের ও ফেরেশতাদের ওপর ন্যস্ত বলেছেন।[৩]

সুতরাং একই কাজ আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত করা ভুল নয়। কারণ, কাজটি সত্তাগতভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যের দ্বারা আল্লাহর শক্তিতে, ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে ঘটে থাকে। তাই আল্লাহ নিজেই তাদের সাথে তা সম্পর্কিত করেছেন। কখনই তাঁর সৃষ্টি তাঁর অনুমতি ও তাঁর দেয়া শক্তি ছাড়া

---

১. প্রাগুক্ত।

২. সূরা নিসা : ৯৭, সূরা আনআম : ৬১, সূরা আনফাল : ৫০, সূরা নাহ্‌ল : ২৮ , ৩২ এবং সূরা মুহাম্মাদ : ২৭ আয়াতগুলোতে প্রাণহরণের কাজটি ফেরেশতাদের বলা হয়েছে অথচ নাহল : ৭০, ইউনূস : ১০৪ এবং যুমার : ৪২ আয়াতগুলোতে প্রাণহরণের কাজটি স্বয়ং আল্লাহর বলা হয়েছে।

৩. সূরা ইউনূস : ৩১, সিজদাহ : ৫ ও অন্যান্য আয়াতে বিশ্বজগতকে আল্লাহই পরিচালনা করেন বলা হয়েছে। অথচ সূরা নাযিয়াতের ৫ আয়াতে আল্লাহর ফেরেশতাদের সকল কার্য পরিচালনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাধীনভাবে কিছুই করতে পারে না। মহান আল্লাহ কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই সকল কাজ করতে পারেন। কিন্তু তিনি বস্তুজগৎ ও সাধারণ সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রয়েছেন বিধায় চেয়েছেন বস্তুজগতকে বিভিন্ন মাধ্যমে পরিচালিত করে তাদের মাধ্যমে নিজের বৈশিষ্ট্যাবলির প্রকাশ ঘটাতে। যেমন সূর্যের মাধ্যমে পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন, অথচ তিনি সূর্য ছাড়াও পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারতেন যেমনটি কিয়ামতে ঘটানো হবে।[১]

অতএব, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া ও অপরের সাহায্য গ্রহণ যদি ঐ সত্তাকে আল্লাহর থেকে স্বাধীন ভেবে (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ভিন্ন নিজেই স্বাধীনভাবে সে কোন কাজ করতে পারে এ বিশ্বাস নিয়ে) করা হয়, তাহলে তা শির্ক হবে, যেমনটি আরবের মুশরিকরা করত। তারা মূর্তির মোকাবিলায় আল্লাহকে অক্ষম মনে করত।[২] তাই তারা মূর্তিদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আল্লাহকে গালমন্দ করতেও কুণ্ঠিত হতো না।[৩]

মহান আল্লাহ বান্দাদের তাঁর পথে ও বালা-মুসিবতে ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য নিতে বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

হে বিশ্বাসিগণ! (বিপদের সময়) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) সাহায্য কামনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।[৪]

এ আয়াতের ভিত্তিতে ধৈর্য ও নামায আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তি ও নৈকট্যের উসিলা। কিন্তু সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম এ দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মহান আল্লাহর

১. সূরা যুমার : ৬৯।
২. তারা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট তো কোন স্পষ্ট প্রমাণ আননি এবং আমরা কেবল তোমার কথায় নিজেদের উপাস্যগুলোকে পরিত্যাগকারী নই এবং তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই। **আমরা এ কথাই বলি যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ কেউতোমার মন্দ করার ইচ্ছা করেছে'** (সূরা হূদ : ৫৩-৫৪)। অর্থাৎ আমাদের মূর্তির মোকাবিলায় আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করতে অক্ষম।
৩. এবং তোমরা তাদের গালমন্দ কর না যাদের তারা আল্লাহকে ছেড়ে আহ্বান করে; কেননা, তারাও অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ করবে (সূরা আনআম : ১০৮)।
৪. সূরা বাকারা : ১৫৩।

পবিত্র সুন্দর নামসমূহ, নবি ও আল্লাহর ওলিগণ, সৎকর্ম, পবিত্র কোরআনসহ অনেক কিছুকেই তা শামিল করে।

রাসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের অনুসৃত রীতিতে তাওয়াস্‌সুল

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস ও তাঁর সাহাবীদের অনুসৃত রীতির আলোকে দুটি দলিল এখানে উল্লেখ করব :

ক. আহমাদ ইবনে হাম্বাল নিজ মুসনাদে উসমান ইবনে হুনাইফ হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

মহানবী (সা.)-এর কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বলল : 'আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেন।' আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন : 'যদি তুমি চাও এখন আমি তোমার জন্য দোয়া করব, তবে এখনই তা করব, আর যদি তুমি চাও পরে দোয়া করব, তবে এখন না করে পরে তা করব, কিন্তু এই শেষেরটিই উত্তম।' অন্ধ লোকটি বলল : 'এখনই দোয়া করুন।' মহানবী (সা.) তাকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ওজু করে দুই রাকাত নামায আদায় করতে বললেন। অতঃপর এভাবে দোয়া করতে বললেন :

'হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তোমার রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি বা তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হে মুহাম্মাদ (সা.)! আমি আমার চাহিদা পূরণের জন্য আপনার উসিলা দিয়ে নিজের প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আমার অভাব দূর হয়; হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে আমার শাফায়াতকারী বানিয়ে দাও।'[১]

হাকেম নিশাবুরী তাঁর 'মুস্তাদরাক' এ হাদিসটি বর্ণনার পর একে একটি সহীহ হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে মাজা আবু ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন : এই রেওয়ায়েতটি সহীহ। তিরমিযি নিজ গ্রন্থ 'আবওয়াবুল আদ্‌ইয়্যাহ'তে এই

১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৮; মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩ (বৈরুত); সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১ (দারুল ইহইয়ায়ে কুতুবিল আরাবিয়্যাহ); আত্ তাজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬; আল জামেউস সাগ্বীর (সুয়ূতী), পৃ. ৫৯; আত তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওয়াসিলাহ (ইবনে তাইমিয়্যাহ), পৃ. ৯৮ (বৈরুত)।

রেওয়ায়েতটির সহীহ হওয়ার প্রতি সমর্থন করেছেন এবং মুহাম্মাদ নাসিবুর রাফায়ীও নিজ গ্রন্থ 'আত্ তাওয়াস্‌সুল ইলা হাক্বীক্বাতিত তাওয়াস্‌সুল' এ বলেন : 'নিঃসন্দেহে এই হাদিসটি সহীহ এবং প্রসিদ্ধ... এই রেওয়ায়েতটি সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর দোয়ার মাধ্যমে সেই অন্ধ লোকটি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল।'[১]

এই রেওয়ায়েত হতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে উসিলা বানানো শুধু যে জায়েয বা বৈধই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) অন্ধ লোকটিকে ওই বিশেষ পন্থায় দোয়া করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মহানবী (সা.)-কে নিজের ও বিশ্বজগতের প্রভুর মাঝে উসিলা হিসেবে উপস্থাপন করে দোয়া করতে বলেছিলেন। আর প্রকৃত অর্থে এটা আল্লাহর ওলিদের প্রতি তাওয়াস্‌সুল তথা তাঁদেরকে উসিলা বানানোর উৎকৃষ্ট দলিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ দোয়ায় প্রথমে আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে দোয়া করার পরপরই রাসূলকে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ একই দোয়ায় আল্লাহর সাথে রাসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দোয়া ও যিয়ারতের মধ্যে একই সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর মনোনীত বান্দাদের আহ্বান করা বৈধ এবং তা শির্ক নয়। যদি এ কাজটি তাঁদের জীবদ্দশায় করা বৈধ হয় তাহলে তাঁদের মৃত্যুর পর কখনই শির্কে পরিণত হতে পারে না।

খ. আবু আবদুল্লাহ্ বুখারী স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বলেছেন :

যখনই ক্ষরা দেখা দিত তখন উমর ইবনে খাত্তাব, রাসূল (সা.)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের উসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে বলতেন : 'হে আল্লাহ! রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর (সা.) উসিলা দিয়ে চাইতাম এবং (আপনি) আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। এখন রাসূল (সা.)-এর চাচার উসিলা দিয়ে চাচ্ছি যাতে আপনি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।' অতঃপর বৃষ্টি আসত।[২]

অতএব, এই আলোচনার মাধ্যমে যারা আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের উসিলা বানানোর বিষয়টিকে শির্ক ও বিদআত হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের কথার ভিত্তিহীনতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

---

১. আত্ তাওয়াসসুল ইলা হাকীকাকাতিত তাওয়াস্‌সুল, পৃ. ১৫৮ (বৈরুত)।
২. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭ (মিসর)।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ও মূর্তিপূজক আবু শাকির

সংকলন : সরকার ওয়াসি আহম্মেদ

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল ও সহনশীল শিক্ষক। তিনি প্রতিদিন তাঁর পাঠদান করতেন। তাঁর বক্তব্য শেষে তিনি তাঁর সমালোচকদের আপত্তিগুলো শুনতেন ও সেগুলোর জবাব দিতেন। তিনি তাঁর ক্লাসে অংশগ্রহণকারী সমালোচকদেরকে করতেন, যাতে তারা তাঁর বক্তব্যের মাঝখানে ব্যাঘাত না ঘটায়। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা আপত্তি উত্থাপন করতে পারত।

একদা তাঁর এক বিরোধী আবু শাকির তাঁকে বলল : 'আপনি কি আমাকে কিছু বলার ও কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি দেবেন?'

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ, তুমি প্রশ্ন করতে পার।'

আবু শাকির বলল : 'এটি কি প্রাচীন কল্পকাহিনী নয় যে, আল্লাহ আছেন? আপনি মানুষকে এমন কিছুতে বিশ্বাস করাতে চান যাঁর অস্তিত্ব নেই। যদি আল্লাহ থাকতেন তবে আমরা তাঁর অস্তিত্ব আমাদের অনুভূতির মাধ্যমে বুঝতে পারতাম। আপনি বলতে পারেন যে, আমরা তাঁর উপস্থিতি অভ্যন্তরীণ অনুভূতি বা চেতনা দ্বারা অনুভব করতে পারি, কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ বোধও আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল।

আমরা কোন কিছুরই প্রতিরূপ কল্পনা করতে পারি না যদি না আমাদের কোন ইন্দ্রিয় সেটার সাথে সম্পৃক্ত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে কখনও দেখি নি তার ছবি আমাদের অভ্যন্তরীণ বোধ দ্বারা কল্পনা করতে পারি না, যদি তার কথা শুনে না থাকি তাহলে তার কণ্ঠস্বর স্মরণ করতে পারি না এবং তার হাতের স্পর্শ অনুভব করতে পারি না যদি না তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে থাকি।

আপনি বলতে পারেন যে, আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারি আমাদের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা– আমাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি বা বহিরাভূতি দ্বারা নয়। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিরও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যের প্রয়োজন হয়– যা ছাড়া এটি কাজ করতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া আমরা কোন যুক্তি উপস্থাপন করতে বা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না।

আপনার কল্পনা দ্বারা আপনি কোন সত্তা তৈরি করেছেন, যা আপনার নিজের প্রতিরূপ। আপনি যেহেতু দেখেন, কথা বলেন, শোনেন, কাজ করেন ও বিশ্রাম নেন, তিনিও সেরকমই করেন যা আপনি করেন।

আপনি তাঁকে কারো নিকট প্রদর্শন করেন না। মানুষের ওপর প্রভাব বজায় রাখার জন্য আপনি বলেন যে, তাঁকে দেখা যায় না। আপনি এও বলেন যে, তাঁর জন্ম কোন মায়ের গর্ভ থেকে হয় নি। তিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং তাঁর মৃত্যুও নেই। আমি শুনেছি যে, ভারতে একটি প্রতিমা রয়েছে যা একটি পর্দার পেছনে লুকানো আছে এবং হিন্দু উপাসকদের যা দেখার অনুমতি নেই।

প্রতিমাটির জিম্মাদাররা বলে যে, এটি প্রতিমাটির কৃপা যে, এটি তাদের সামনে আসে না। কারণ, যে কেউ তার ওপর দৃষ্টি দেবে সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে।

আপনার আল্লাহও হিন্দুদের পর্দাবৃত খোদার মতো। তাঁর কৃপা যে, তিনি আমাদের সামনে প্রকাশিত হন না। যদি তিনি প্রকাশিত হন তবে আমরা অবশ্যই মারা যাব। আপনি বলেন যে, বিশ্বজগৎ আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট, যিনি একমাত্র ইসলাম ধর্মের নবি ব্যতীত আর কারও সাথে কথা বলেন না। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, বিশ্বজগৎ নিজে থেকেই অস্তিত্বে এসেছে। কেউ কি ঘাস সৃষ্টি করে যা মাঠে জন্মায়? এটি কি নিজেই জন্মায় না এবং সবুজ রং ধারণ করে না? কেউ কি পিঁপড়া ও মশা সৃষ্টি করেছে? তারা কি নিজেদের থেকেই আসে নি?

আপনি, যিনি নিজেকে একজন পণ্ডিত ও নবির উত্তরাধিকারী দাবি করেন, আপনাকে আমার বলতেই হচ্ছে যে, জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত সকল কল্পকাহিনীর মধ্যে আল্লাহ, যাঁকে দেখা যায় না, তাঁর সংক্রান্ত কল্পকাহিনীর চেয়ে অসম্ভব ও ভিত্তিহীন কাহিনী আর নেই।

অনেক ভিত্তিহীন গল্প রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কমপক্ষে বাস্তব জীবনকে তুলে ধরে এবং আমাদের সামনে মানুষজন ও কিছু ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপন করে যারা হয়তো বা কাল্পনিক, কিন্তু তাদের আচরণ ও কাজ বাস্তব মানুষের মতো। আমরা তাদেরকে দেখতে পারি। তারা ভক্ষণ করে, পান করে, কথা বলে, ঘুমায় এবং ভালোবাসে। আমরা যখন এই কাহিনীগুলো পড়ি তখন আমরা তা উপভোগ করি। আমরা জানি যে, সেগুলো মিথ্যা, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর মুখ দেখি যারা আমাদের মতো। গল্পে উল্লিখিত লোকগুলোর অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞান এই দুনিয়াতে এই ধরনের ব্যক্তিদের অস্তিত্বকে মেনে নেয়। সুতরাং যখন আমরা আপনার আল্লাহকে দেখতে পাই না, অনুভব বা স্পর্শ করতে পারি না তখন আমাদের যুক্তিবুদ্ধি–যা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর নির্ভর করে–তাঁর অস্তিত্বকে মেনে নেয় না।

আমি জানি যে, কিছুসংখ্যক ব্যক্তি, যারা আপনার দ্বারা প্রতারিত হয়েছে তারা আপনার অদৃশ্য আল্লাহয় বিশ্বাস করে। কিন্তু আপনি আমাকে প্রতারিত করতে পারবেন না এবং আমাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাতে পারবেন না। আমি কাঠ ও পাথরের তৈরি খোদার পূজারি। যদিও আমার খোদা কথা বলে না, কিন্তু আমি আমার চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে পাই এবং আমার হাত দ্বারা তাকে স্পর্শ করতে পারি।

আপনি বলবেন যে, যে খোদা আমার নিজ হাতে তৈরি তা উপাসনার যোগ্য নয়, অথচ আপনি মানুষকে আল্লাহর উপাসনা করতে বলেন যা আপনি আপনার কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আপনি অনেক নিষ্পাপ মানুষকে এটি বলে প্রতারিত করেছেন যে, আপনার কল্পনাকৃত আল্লাহ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আমি কাউকে প্রতারিত করি না। এই বিশ্বজগৎ কেউ সৃষ্টি করে নি। এটি সৃষ্টি করার জন্য কোন খোদার প্রয়োজন হয় নি। এটি নিজে থেকেই এসেছে। খোদা কোন কিছু তৈরি করতে পারে না। সে নিজেই আমাদের সৃষ্টি। আমি তাকে আমার হাত দ্বারা ও আপনি আপনার কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।'

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) আবু শাকিরের এই দীর্ঘ বক্তব্যের মাঝে একটি কথাও বলেন নি। কোন কোন সময় তাঁর ছাত্ররা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সেখানে ব্যাঘাত ঘটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদেরকে চুপ থাকতে বলেন। যখন আবু

শাকির তার দীর্ঘ বক্তব্য থামাল তখন ইমাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার আরো কিছু বলার আছে কিনা? আবু শাকির প্রত্যুত্তরে বলল : 'অদৃশ্য আল্লাহকে মানুষের মাঝে পরিচিত করানোর মাধ্যমে আপনি ধন-সম্পদ, পদ এবং একটি সম্মানজনক, আরামদায়ক ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে চান। এগুলোই আমার শেষ কথা। আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

ইমাম জাফর আস সাদিক (আ.) বললেন : 'আমি তোমার বক্তব্যের শেষ অংশ থেকে শুরু করতে চাই। তোমার এই অভিযোগ যে, আমি অর্থ, পদ এবং আরামদায়ক জীবন চাই তা সমর্থনযোগ্য হতো যদি আমি খলিফার মতো জীবন যাপন করতাম। তুমি আজকে দেখেছ যে, আমি শুধু কয়েক লোকমা রুটি খেয়েছি, আর কিছুই নয়। আমি তোমাকে আমার বাড়িতে দাওয়াত করছি তোমার নিজের চোখে দেখার জন্য যে, আজ আমার রাতের খাবার কী এবং আমি কীভাবে জীবন যাপন করি।'

'আবু শাকির! যদি আমি ধন-সম্পদ অর্জন ও ভালোভাবে জীবন যাপন করতে চাইতাম তবে সম্পদশালী হওয়ার জন্য আমি শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারে লিপ্ত হতাম না। আমি রসায়নশাস্ত্রের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতাম ও সম্পদশালী হয়ে যেতাম। ধনী হওয়ার অন্য একটি উপায় হচ্ছে ব্যবসা করা। বিদেশি বাজার সম্পর্কে মদীনার যে কোন ব্যবসায়ীর চেয়ে আমার অধিক জ্ঞান আছে। আমি জানি যে, বিভিন্ন দেশে কোন্ পণ্য উৎপাদিত হয় ও সেগুলো কোথায় লাভে বিক্রয় করা যায়। আমি এও জানি যে, কম পরিবহন খরচে কীভাবে তা এখানে আনা যাবে। আমাদের ব্যবসায়ীরা শুধু সিরিয়া, ইরাক, মিশর এবং অন্যান্য আরব অঞ্চল হতে পণ্য আমদানি করে। তারা জানে না যে, ইসফাহান, রোস্ত এবং রোমে কোন্ কোন্ পণ্য পাওয়া যায়। না হলে তারা তা আমদানি করত ও লাভে বিক্রি করত।'

'আবু শাকির! তুমি বলেছ যে, আমি আল্লাহকে উপাসনা করতে বলি মানুষকে প্রতারিত করা এবং ধনী হওয়ার জন্য। আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, উপহার হিসেবে দেয়া কিছু ফল ছাড়া আমি কখনই কারো কাছ থেকে কিছু নেই নি। আমার এক বন্ধু আমার জন্য প্রতি বছর তার বাগান হতে তাজা খেজুর পাঠায় এবং আরেক জন তায়েফ থেকে কিছু ডালিম পাঠায়। আমি এ উপহারগুলো গ্রহণ করি যাতে তারা ব্যথিত না হয় এজন্য।'

'আমি শুনেছি, হে আবু শাকির! তোমার বাবা একজন মুক্তার বণিক ছিলেন। সম্ভবত তোমারও মুক্তা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে। কিন্তু আমি সকল প্রকার মুক্তা ও দামি পাথর সম্পর্কে জানি। আমি সেগুলোর বাজার মূল্যও বলতে পারি। আমি যদি ধনী হতে চাইতাম তবে আমি রত্ন ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করতাম। তুমি কি একটি মূল্যবান পাথর পরীক্ষা ও চিহ্নিত করতে পার? তুমি কি জান, পৃথিবীতে কত প্রকার রুবি ও পান্না আছে?'

আবু শাকির জবাব দিল : 'আমি সেগুলো সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

ইমাম জাফর সাদিক জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কি জান, কত প্রকার হীরা আছে এবং সেগুলোর রং কী?'

আবু শাকির বলল : 'আমি জানি না।'

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বললেন : 'আমি রত্ন ব্যবসায়ী নই, কিন্তু আমি সকল প্রকার মুক্তা ও দামি পাথর সম্পর্কে জানি। আমি এও জানি যে, এগুলো কোথা থেকে আসে। সকল ব্যবসায়ী মুক্তা সম্পর্কে জানে– যা আমি জানি, কিন্তু খুবই কম লোকই এগুলোর উৎস সম্পর্কে জানে।'

'তুমি কি জান, একটি হীরাকে কোন্ জিনিসটি চকচকে করে তোলে?'

আবু শাকির জবাব দিল : 'আমি কখনই হীরার বণিক ছিলাম না, আমার বাবাও ছিলেন না। আমি কিভাবে জানব যে, হীরা কীভাবে চকচক করে?'

ইমাম বললেন : 'হীরা নদী ও ঝরনার তলদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়। রুক্ষ হীরা পারদর্শীদের দ্বারা কাটানো হয়। এই কাটাই একে অত্যুজ্জ্বলতা দেয়। যারা হীরা কাটায় পারদর্শী তারা ছোট বেলা থেকেই তাদের পিতৃপুরুষদের পেশার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়। হীরা কাটা একটি সূক্ষ্ম ও কঠিন শিল্প। একটি হীরা শুধু আরেকটি হীরা দ্বারাই কাটা হয়।'

'আবু শাকির! আমি এই সমস্ত কিছু বলেছি তোমাকে এটি দেখানোর জন্য যে, যদি আমি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে চাইতাম তাহলে আমি রত্ন সম্পর্কিত আমার জ্ঞানের মাধ্যমে তা করতে পারতাম। আমি তোমার অভিযোগের জবাব দিয়েছি। আর এখন আমি তোমার আপত্তিগুলো নিয়ে কথা বলব।'

'আবু শাকির! তুমি বলেছ যে, আমি গল্প বানাই ও মানুষকে আল্লাহ উপাসনা করতে বলি যাঁকে দেখা যায় না। তুমি আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার কর। কারণ, তাঁকে দেখা যায় না। তুমি কি তোমার নিজের শরীরের ভেতরে দেখতে পার?'

আবু শাকির জবাব দিল : 'না, আমি দেখতে পারি না।'

ইমাম জাফর সাদিক বলেন : 'যদি তুমি তোমার শরীরের ভেতরে কী আছে তা দেখতে পারতে তবে তুমি বলতে পারতে না যে, তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস কর না, যাঁকে দেখা যায় না।'

আবু শাকির বলল : 'একজনের শরীরের ভেতরে দেখার সাথে আপনার অদৃশ্য আল্লাহর অস্তিত্বের সম্পর্ক কী?'

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) জবাব দিলেন : 'তুমি এখনই বলেছ যে, যা দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, যার স্বাদ নেয়া যায় না বা যার কথা শোনা যায় না তার অস্তিত্ব নেই।'

আবু শাকির বললেন : 'হ্যাঁ, আমি তা বলেছি এবং আমি তা সত্য বলে বিশ্বাস করি।'

জাফর সাদিক (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কি তোমার শরীরের ভেতরে রক্ত চলাচলের শব্দ শুনতে পাও?'

আবু শাকির বলল : 'না, আমি তা শুনতে পাই না। কিন্তু রক্ত কি শরীরে চলাচল করে?'

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বললেন : 'হ্যাঁ, এটি চলাচল করে। এটি তোমার শরীরের মধ্যে একটি বর্তনী তৈরি করে। যদি রক্ত প্রবাহ কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তুমি মারা যাবে।'

আবু শাকির বলল : 'আমি এটি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, রক্ত শরীরের অভ্যন্তরে চলাচল করে।'

ইমাম জাফর সাদিক বললেন : 'তোমার অজ্ঞতা তোমাকে বিশ্বাস করতে দিচ্ছে না যে, তোমার শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং একই অজ্ঞতা তোমাকে সেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে দেয় না যাঁকে দেখা যায় না।'

অতঃপর ইমাম আবু শাকিরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে ওই ক্ষুদ্র জীবন্ত সত্তাকে দেখেছে কিনা যা আল্লাহ তার শরীরের ভেতর সৃষ্টি করেছেন।

জাফর আস সাদিক বলতে থাকলেন : 'এসব ক্ষুদ্র জীব এবং এদের চমৎকার কাজের জন্যই তুমি বেঁচে আছ। তারা এত ক্ষুদ্র যে, তুমি তা দেখতে পাও না। যেহেতু তুমি তোমার ইন্দ্রিয়ের দাস, তাই তুমি তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জান না। তুমি যদি তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর এবং তোমার অজ্ঞতা হ্রাস কর তাহলে তুমি জানতে পারবে যে, তোমার শরীরে এই ক্ষুদ্র জীবগুলো মরুভূমির বালুকণার মতোই বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান।

এগুলো তোমার শরীরেই জন্মায়, তোমার শরীরেই বৃদ্ধি পায়, তোমার শরীরের মধ্যে কাজ করে ও তোমার শরীরেই মারা যায়। কিন্তু তুমি তা দেখতে পার না, স্পর্শ করতে পার না, স্বাদ গ্রহণ করতে পার না বা জীবনে শুনতেও পার না।'

'এটি সত্যি, যে নিজের সম্পর্কে জানে সে তার আল্লাহ সম্পর্কেও জানে। যদি তুমি তোমার সম্পর্কে জানতে এবং তোমার শরীরে কী হচ্ছে সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে তবে তুমি বলতে না যে, তুমি আল্লাহকে দেখা ছাড়া বিশ্বাস কর না।'

ইমাম জাফর সাদিক একটি পাথরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন : 'আবু শাকির! তুমি কি একটি পাথরটি দেখছে পাচ্ছ, যা ঐ স্তম্ভের নিচে আছে? তোমার কাছে এটি জীবনহীন এবং স্থির, কারণ, তুমি সেই প্রাণবন্ত গতি দেখতে পাও না যা পাথরটির মধ্যে রয়েছে। আবারও এটি তোমার জ্ঞানের স্বল্পতা বা তোমার অজ্ঞতা যা তোমাকে বিশ্বাস করতে দেয় না যে, পাথরের মধ্যে গতি রয়েছে। এক সময় আসবে যখন জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐ গতি দেখতে পাবে যা পাথরের মধ্যে আছে।

ইমাম বলতে থাকলেন : 'আবু শাকির! তুমি বলেছ যে, এই বিশ্বজগতের সমস্ত কিছু নিজে থেকেই এসেছে এবং কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তুমি মনে কর যে, মাঠের ঘাস নিজেই জন্মায় ও নিজে থেকেই সবুজ। তোমার অবশ্যই জানা দরকার যে, ঘাস বীজ ছাড়া জন্মায় না ও বীজ অঙ্কুরিত হয় না আর্দ্র মাটি ছাড়া এবং বৃষ্টি ব্যতীত কোন আর্দ্র মাটি হয় না। আবার বৃষ্টি নিজে থেকে বর্ষিত হয় না। প্রথমে পানি বাষ্পীভূত হয় এবং বায়ুমণ্ডলের ওপরে মেঘ আকারে জমা হয়। বায়ু মেঘ বহন করে নিয়ে আসে।

এরপর বাষ্পীভূত পানি ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টির ফোটা রূপে পতিত হয়। বৃষ্টি হতে হবে যথাসময়ে, অন্যথায় ঘাসও জন্মাবে না এবং তা সবুজও হবে না।

দশ প্রজাতির ভেষজ বীজ নাও এবং একটি কৌটার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ, যার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি আছে, কিন্তু কোন বায়ু নেই। সেগুলো কি অঙ্কুরিত হবে? না, পানির সাথে সাথে বীজগুলোর জন্য বায়ুও প্রয়োজন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় উষ্ণ ঘরে ঘাস, ভেষজ উদ্ভিদ এবং ফল উৎপাদন করা সম্ভব, যদি সেখানে পর্যাপ্ত বায়ু থাকে। বায়ুর উপস্থিতি ছাড়া মাঠে কোন ঘাস জন্মাবে না এবং সবুজও হবে না। যদি বায়ু না থাকে তাহলে সমস্ত উদ্ভিদ, মানুষসহ সকল জীবজন্তু মারা যাবে।'

'আবু শাকির! তুমি কি বায়ু দেখতে পার যার ওপর তোমার পুরো অস্তিত্বই নির্ভরশীল? তুমি এটি অনুভব করতে পার যখন তা প্রবাহিত হয়। তুমি কি বাতাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারবে? তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে যে, ঘাসের জন্মানো ও সবুজ হওয়ার অনেক জিনিসের প্রয়োজন, যেমন- ঘাসের বীজ, মাটি, পানি, বায়ু, একটি উপযোগী আবহাওয়া এবং সর্বোপরি একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা– যেটি বিভিন্ন ধরনের উপাদানের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ সম্পাদন করে। এই ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়কারী শক্তিই হলো আল্লাহ।

'তুমি বল যে, সবকিছু নিজে থেকেই এসেছে, কারণ, তুমি বিজ্ঞানী নও। কোন বিজ্ঞানীই এমনটা বলবে না। সকল বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত একজন আবিষ্কারককে বিশ্বাস করে যদিও তারা তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকতে পারে। আর যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, তারাও একটি সৃজনশক্তিতে বিশ্বাস করে।'

'হে আবু শাকির! এটি জ্ঞানের করণে নয়, বরং কারো অজ্ঞতার জন্য যে, সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। যখন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে তখন সে দেখে যে তার নিজের শরীর নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন যাতে এর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কার্য যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়। এরপর সে অনুভব করে যে, এই বিশাল বিশ্বজগতেরও একজন নিয়ন্ত্রক বা তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজন যাতে এটি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।'

'তুমি এখনই বলেছ যে, আমরা দু'জনই আমাদের খোদাকে সৃষ্টি করেছি– তুমি তোমার হাত দ্বারা এবং আমি আমার কল্পনা দ্বারা। কিন্তু এখানে তোমার খোদা ও

আমার আল্লাহর মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। তোমার খোদাকে তুমি কাঠ, পাথর দ্বারা সৃষ্টি করার আগে তার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আমার আল্লাহর অস্তিত্ব আমি তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করার আগে থেকেই ছিল। আমি আমার আল্লাহকে আমার হাত বা বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্টি করি না। আমি যা করি তা হল আমি উত্তমরূপে তাঁর পরিচয় লাভ করি এবং তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করি। যখন তুমি কোন পাহাড় দেখ তখন সেটা সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা কর। এটি কল্পনার মাধ্যমে পাহাড় তৈরি করা নয়। তুমি পাহাড়টিকে দেখার আগে পাহাড়টি ছিল এবং যখন তুমি চলে যাবে তখনও এটি থাকবে।'

'তোমার সীমিত জ্ঞানের কারণে তুমি পাহাড় সম্পর্কে খুব বেশি জানতে পার না। তোমার জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাবে, তুমি এটি সম্পর্কে ততই জানতে পারবে। এটি তোমার পক্ষে জানা অসম্ভব যে, কখন এবং কীভাবে পাহাড়টি অস্তিত্বে এসেছিল এবং কখন এটি বিলীন হয়ে যাবে। তুমি এটি জানতে পারবে না যে, এর অভ্যন্তরে বা নিচে কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থ আছে এবং মানবজাতির জন্য সেগুলোর উপকারিতাসমূহ কী কী।'

'তুমি কি জান যে, ওই পাথর যা দিয়ে তুমি মূর্তি তৈর কর তা হাজার বছর আগের ও তা আরও হাজার বছর অস্তিত্বমান থাকবে। এ পাথরগুলো অনেক দূর থেকে এখানে এসেছে। এগুলো এতদূর ভ্রমণ করে আসতে পেরেছিল এ কারণে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সবসময় চলমান, কিন্তু এই চলা এত ধীর গতির যে, তুমি তা অনুভব কর না। এ বিশ্বজগতের এমন কিছুই নেই যার গতি নেই। বিশ্রাম বা স্থিরতার কোন অর্থ নেই। যখন আমরা ঘুমাই তখনও আমরা স্থির নই। আমরা গতির মধ্যে রয়েছি। কারণ, পৃথিবী গতিশীল। এছাড়াও আমাদের শরীরের মধ্যেও গতি আছে।'

'হে আবু শাকির! তোমার যদি এই পাথরের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকত যা দ্বারা তুমি একটি মূর্তি তৈরি কর তবে তুমি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে না এবং বলতে না যে, আমি আমার কল্পনা দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করেছি। তুমি জান না, পাথর কী এবং তা কীভাবে এসেছে। তুমি আজকে তা যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করতে পার এবং আকার বা আকৃতি দিতে পার। কিন্তু একটি সময়ে তা তরল অবস্থায় ছিল। ধীরে ধীরে তা ঠাণ্ডা হয়েছে ও আল্লাহ তা কঠিন করেছেন। প্রথমে এটি কিছুটা ভঙ্গুর প্রকৃতির ছিল এবং এক টুকরা কাচের মতোই ভেঙে যেত।'

আবু শাকির জিজ্ঞাসা করল : 'এটি কি আগে তরল রূপে ছিল?'

জাফর আস সাদিক (আ.) জবাব দিলেন : 'হ্যাঁ এটি সেভাবেই ছিল।'

আবু শাকির হাসিতে ঢলে পড়ল। ইমাম জাফর সাদিকের একজন ছাত্র রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর শিক্ষক কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

আবু শাকির বলল : 'আমি এ কারণে হাসছি যে, আপনি বলছেন যে, পাথর পানির তৈরি।'

জাফর সাদিক (আ.) জবাব দিলেন : 'আমি বলি নি যে, পাথর পানির তৈরি। আমি যা বলেছি তা হলো শুরুতে সেগুলো তরল অবস্থায় ছিল।'

আবু শাকির বলল : 'এখানে পার্থক্য কী? তরল এবং পানি তো একই জিনিস।'

ইমাম জাফর সাদিক জবাব দিলেন : 'অনেক তরল পদার্থই রয়েছে যেগুলো পানি নয়। দুধ এবং ভিনেগার তরল, যদিও এ দুটির মধ্যে পানির উপাদান আছে, কিন্তু এদুটি পানি নয়। শুরুতে পাথর পানির ন্যায় তরল ছিল ও পানির মতো প্রবাহিত হতো। ধীরে ধীরে এগুলো ঠাণ্ডা এবং কঠিন হয়েছে যাতে তুমি সেগুলো কাটতে পার ও মূর্তি তৈরি করতে পার। এই একই পাথর তরল পদার্থে পরিণত হবে যদি সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়।'

আবু শাকির বলল : 'যখন আমি বাড়িতে যাব তখন আমি আপনার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করব। আমি ঘর গরাম করার চুলার ওপর পাথর রাখব এবং দেখব তা তরল পদার্থে পরিণত হয় কিনা।'

ইমাম বললেন : 'তুমি তোমার ঘর গরম করার চুলায় পাথর তরল করতে পারবে না। তুমি কি এক টুকরা লোহাকে বাড়িতে গলাতে পারবে? কঠিন পাথর তরল করতে অতি উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন।'

'তুমি কি অনুধাবন কর যে, কীভাবে তুমি পাথর থেকে মূর্তি বানাতে পার? যিনি পাথর সৃষ্টি করেছেন তিনিই আল্লাহ। আর তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আঙ্গুলসহ হাত দিয়েছেন যা তোমাকে যন্ত্র চালনা করে পাথর থেকে মূর্তি তৈরি করতে সক্ষম করেছে। আবার তিনিই সেই যিনি তোমাকে ক্ষমতা এবং বুদ্ধি দিয়েছেন যা তুমি মূর্তি তৈরিতে ব্যবহার করেছ।'

‘আবু শাকির! তুমি কি মনে কর যে, পাহাড়সমূহ শুধু পাথরের স্তূপ? মহান আল্লাহ সেগুলো সৃষ্টি করেছেন কিছু অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এগুলো এজন্য সৃষ্টি হয় নি যাতে তুমি সেগুলো নাও এবং সেগুলোকে মূর্তিতে রূপান্তরিত কর। যেখানেই পাথর আছে সেখানে প্রবাহিত পানি রয়েছে। বৃষ্টি এবং তুষার, যা পাহাড়ের চুড়ার ওপর পড়ে তা বিশুদ্ধ পানির ঝরনার উৎস। এই ঝরনা একত্র হয়ে বড় নদী তৈরি করে যা মাঠ ও কৃষিকাজে পানি সিঞ্চন করে। উপত্যকায় যে সকল লোক বসবাস করে তারা অব্যাহতভাবে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ পায়। যেসকল মানুষের সামর্থ্য রয়েছে তারা গ্রীষ্মকালে সমতল ভূমির উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ে চলে যায়।’

‘পাহাড়সমূহ ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা ও ধ্বংস থেকে শহর এবং গ্রাম সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাধ হিসেবে কাজ করে। সবুজ পাহাড় ভেড়ার জন্য ভালো চারণভূমি। যখন সমতলের চারণভূমিতে ঝলসানো তাপ থাকে এবং গবাদি পশুর খাবার থাকে না তখন মেষপালকরা তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে পাহাড়ে যায় এবং গ্রীষ্মকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে। পাহাড় পশু ও পাখির আবাসস্থলও বটে, যেগুলোর কিছু কিছু সেখানে বসবাসকারীদের খাবারের ভালো উৎসও বটে। যে পাহাড়গুলো সবুজ নয় সেগুলোও ব্যবহারহীন নয়। যদি মানুষ চেষ্টা করে তাহলে তারা সেসব পাহাড়ের অভ্যন্তরে ধাতু ও খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করতে পারে যেগুলো মানুষের জন্য উপকারী।’

‘হে আবু শাকির! আমি খুবই ক্ষুদ্র ও দুর্বল যে, আমার মগজ দ্বারা আল্লাহকে সৃষ্টি করব। তিনিই আমার মগজ সৃষ্টি করেছেন যাতে আমি তাঁকে নিয়ে চিন্তা করি এবং জানতে পারি যে, তিনি আমার সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমার আগে থেকেই ছিলেন এবং আমি যখন থাকব না তখনও তিনি থাকবেন। তবে আমি এটি বলতে চাচ্ছি না যে, আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাব। বিশ্বজগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় না। সবকিছুই পরিবর্তনশীল। কেবল আল্লাহই পরিবর্তিত হন না।’

‘আবু শাকির! অন্তর থেকে বল তো, যখন তুমি সমস্যায় পড়বে তখন কার কাছে যাবে? তুমি কি আশা কর, যে মূর্তিকে তুমি পাথর কেটে তৈরি করেছ সে তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে? এটি কি তোমাকে রোগ থেকে আরোগ্য দিতে পারে যখন তুমি অসুস্থ হও? এটি কি তোম কে দুর্ভাগ্য এবং অশান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে?

তোমাকে ক্ষুধা থেকে বাঁচাতে পারে এবং তোমার ঋণ পরিশোধে সাহায্য করতে পারে?'

আবু শাকির জবাব দিল : 'আমার পাথরটি থেকে এমন কোন আশা নেই, কিন্তু আমি মনে করি পাথরটির অভ্যন্তরে এমন কিছু রয়েছে যা আমাকে সাহায্য করবে। তাছাড়া আমি একে উপাসনা করা ছাড়া থাকতে পারি না।'

ইমাম জাফর আস সাদিক জিজ্ঞাসা করলেন : 'পাথরটির ভেতর কী আছে? এটিও কি পাথর?'

আবু শাকির জবাব দিল : 'আমি জানি না যে, তা কী। তবে যদি সেটাও পাথরই হয় তাহলে তা আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

ইমাম জাফর আস সাদিক বললেন : 'হে আবু শাকির! যা পাথরের ভেতরে রয়েছে এবং যা পাথর নয় এবং তোমার সমস্যার সময় তোমাকে সাহায্য করতে পারে তিনিই হলেন আল্লাহ।'

আবু শাকির বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল এবং তারপর বলল : 'আল্লাহ, যাঁকে দেখা যায় না, তিনিই কি পাথরের মধ্যে আছেন?'

ইমাম বললেন : 'তিনি সর্বত্র বিরাজমান।'

আবু শাকির বলল : 'আমি বিশ্বাস করি না যে, যা সর্বত্র বিরাজমান, তা অদৃশ্য হতে পারে।'

ইমাম বললেন : 'তুমি কি জান, বায়ু সর্বত্র আছে, কিন্তু দেখা যায় না?'

আবু শাকির বলল : 'যদিও আমি বায়ু দেখতে পাই না, তবে কমপক্ষে আমি এর উপস্থিতি অনুভব করতে পারি– যখন তা প্রবাহিত হয়, কিন্তু আপনার আল্লাহকে দেখতেও পারি না, তাঁর উপস্থিতিও অনুভব করতে পারি না।'

ইমাম জাফর আস সাদিক বললেন : 'যখন বায়ু প্রবাহিত হয় না তখন তুমি তা অনুভব কর না। বায়ু আল্লাহর একটি সৃষ্টিমাত্র। তিনি সর্বত্র, কিন্তু তুমি তোমার ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখতে পার না বা সেটার উপস্থিতি বুঝতে পার না। তুমি এই মাত্র স্বীকার করেছ যে, তুমি যদিও তা দেখ না, কিন্তু তোমার সহজাত প্রকৃতি বা তোমার আত্মা বলে যে, পাথরের মধ্যে কিছু আছে এবং সেটি পাথর নয়– যা তোমাকে সাহায্য

করতে পারে। এই কিছু একটাই হল 'আল্লাহ'। তোমার সহজাত প্রকৃতিও বলে যে, তুমি আল্লাহকে ছাড়া এবং তাঁকে উপাসনা ছাড়া থাকতে পার না।'

আবু শাকির বলল : 'এটি সত্য? আমি মূর্তির উপাসনা ছাড়া থাকতে পারি না।'

ইমাম জাফর আস সাদিক বললেন : 'মূর্তি বল না, বল 'আল্লাহ'। কেবল তিনিই উপাসনার যোগ্য। তোমার মতো সবাই তাঁকে উপাসনা করতে বাধ্য। যে আল্লাহর উপাসনা করে না তার কোন পথপ্রদর্শক এবং অভিভাবক নেই। সে তার মতো যে দেখতে পারে না, শুনতে পারে না, অনুভব করতে পারে না এবং চিন্তা করতেও পারে না। সে জানে না কোথায় যেতে হবে এবং সমস্যার সময় কার ওপর নির্ভর করতে হবে। আল্লাহর উপাসনা করা জীবন যাপনের একটি অংশ। সকল জীবন্ত সত্তাই তাঁকে স্বভাবগতভাবে উপাসনা করে। এমনকি জীবজন্তুরাও তাঁকে উপাসনা ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমরা সেগুলোকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না এবং তারাও বলতে পারে না যে, তারা আল্লাহর উপাসনা করে। কিন্তু তাদের সুশৃঙ্খল এবং নিয়মমাফিক জীবনযাপনই সেগুলোর আল্লাহকে উপাসনা করার প্রমাণ।'

'আমি এটি বলছি না যে, আমরা যেভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং তাঁর উপাসনা করি, জীবজন্তুও সেভাবে আল্লাহয় বিশ্বাস করে এবং তাঁকে উপাসনা করে। কিন্তু এখানে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার আইন বিশ্বস্ততার সাথে মেনে চলে– যা থেকে বোঝা যায় যে, সেগুলো তাঁকে উপাসনা করে। যদি তারা সৃষ্টিকর্তার অনুগত না হতো তবে সেগুলোর জীবন এত সুশৃঙ্খল ও নিময়মাফিক হতে পারত না।'

'আমরা দেখি যে, বসন্তের আগমনের আগে টিটমাউস (এক ধরনের ক্ষুদ্র পাখি) সর্বদা একই সময়ে আসে এবং গান গায় যেন তা আমাদেরকে নতুন ঋতুর আগাম বার্তা দেয়। এই পরিযায়ী পাখির ভ্রমণ এতই শৃঙ্খল এবং সময় এতটাই নির্ধারিত যে, যদি শীতকালের শেষ দিনেও ঠাণ্ডা থাকে তাহলেও সেগুলোর আসতে কয়েকদিনের বেশি দেরি হয় না। যখন চিলচিলা (এক ধরনের পরিযায়ী পাখি) হাজার মাইল ভ্রমণের পর যখন ফিরে আসে তখন এটি একই জায়গায় বাসা বানায় যেখানে এটি গত বসন্তেও বাসা বানিয়েছিল। যদি সেগুলো আল্লাহর আইন মেনে না চলত এবং তাঁকে উপাসনা না করত তবে কি এই ছোট পাখিগুলোর পক্ষে এত সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা সম্ভব হতো?'

'হে আবু শাকির! গাছগুলো পর্যন্ত আল্লাহর আইন মেনে চলে বিশ্বস্ততার সাথে এবং তাঁর উপাসনা করে। ১৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ, যেগুলোর পরবর্তীকালে আরও শত শত উপপ্রজাতিতে বিভক্ত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে তুমি একটি উদ্ভিদও খুঁজে পাবে না যেটির জীবন বিশৃঙ্খল এবং অগোছালো।'

'হে আবু শাকির! আমাদের মতো উদ্ভিদও সেগুলোর সৃষ্টিকর্তাকে দেখে নি, সেগুলো স্বভাবগতভাবে তাঁর আইন মেনে চলে এবং তাঁর উপাসনা করে।'

'আমি জানি যে, তুমি স্বীকার করবে না, কিংবা আমি যা বলছি তুমি তা বুঝবে না। জটিল বিষয়াদি বোঝার জন্য একজন মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।'

'হে আবু শাকির! শুধু জীবজন্তু সেগুলোর প্রাণিসুলভ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এবং উদ্ভিদ সেগুলোর স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁকে উপাসনা করে না; বরং প্রাণহীন এবং জড় বস্তুও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আল্লাহকে মানে এবং তাঁর উপাসনা করে। যদি সেগুলো তাঁকে উপাসনা না করত তাহলে সেগুলো তাঁর আইন মেনে চলত না। ফলস্বরূপ সেগুলো অণুসমূহ ভেঙে যেত এবং সেগুলো ধ্বংস হয়ে যেত।'

'সূর্য হতে যে আলো আসে তাও আল্লাহর আইন–যা খুবই নির্ধারিত ও নিখুঁত–মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর উপাসনা করে। এটি দুইটি বিপরীতধর্মী শক্তি থেকে অস্তিত্বে আসে। এই শক্তি দুটিও আল্লাহর আইন মেনে চলে এবং তাঁর উপাসনা করে, নতুবা সেগুলো আলো তৈরি করতে পারত না।'

'হে আবু শাকির! যদি আল্লাহ না থাকতেন তবে মহাবিশ্বও থাকত না এবং তুমি এবং আমিও থাকতাম না। 'কোন আল্লাহ নেই'– এই বাক্যটি অর্থহীন। অবশ্যই আল্লাহর অস্তিত্ব থাকতে হবে। যদি এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর মনোযোগ বিশ্বজগত ভিন্ন অন্যদিকে চলে যায় তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্বজগতের সবকিছুই তাঁর আইন মেনে চলে– যা চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী। পরম প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কারণে তিনি এমন সুন্দর আইন তৈরি করতে পেরেছেন– যা চিরস্থায়ী। তাঁর তৈরি প্রতিটি আইন-কানুনেরই কিছু বিশেষ ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য রয়েছে।'

যখন ইমাম তাঁর বক্তৃতা থামালেন তখন আবু শাকির গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে গেল যেন সে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

ইমাম জাফর আস সাদিক জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কি এখন সেই আল্লাহতে বিশ্বাস কর– যাঁকে দেখা যায় না, তিনি অস্তিত্বমান এবং তুমি যার উপাসনা কর তিনি সেই অদৃশ্য আল্লাহ?'

আবু শাকির জবাব দিল : 'আমি এখনও নিশ্চিত নই। আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। আমি আমার বিশ্বাস ও প্রত্যয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সংশয় ও সন্দেহে নিপতিত হয়েছি।'

জাফর আস সাদিক মন্তব্য করলেন : 'মূর্তিপূজা সম্পর্কে সন্দেহ করা হলো আল্লাহকে উপাসনা করার সূচনা।'

বিবাহ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও মোহরানা

আয়াতুল্লাহ ইবরাহীম আমিনী

পরিবার হলো ক্ষুদ্র সামাজিক একক যা শুরু হয় স্বামী ও স্ত্রীর একত্র বা সমবেত হওয়ার মাধ্যমে এবং তা দৃঢ় হয় সন্তান-সন্ততি জন্মের মাধ্যমে। বিবাহ মানব জাতির স্বাভাবিক প্রয়োজন যা অনুমোদিত হয় বিবাহ চুক্তির নির্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করার মাধ্যমে।

ইসলাম পরিবার গঠনের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং একে একটি পবিত্র কর্ম বলে বিবেচনা করে। অনেক হাদিস পরিবারকে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম বলে বিবেচনা করে। ইমাম বাকের (আ.) মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন : 'ইসলামে বিবাহের চেয়ে কোন প্রতিষ্ঠানই গঠিত হয় নি যা সম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ কর্তৃক অধিক পছন্দনীয়।'[১]

ইমাম সাদিক (আ.) মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন : 'ইসলামে কোন কিছুই আল্লাহর কাছে একটি বাড়ির চেয়ে অধিক পছন্দনীয় নয় যে বাড়িটি বিবাহের মাধ্যমে জনবহুল হয়েছে এবং কোন কিছুই আল্লাহর কাছে অধিক ঘৃণিত নয় সেই বাড়ি ছাড়া যা তালাকের মাধ্যমে ভেঙে গেছে।[২]

বিবাহ ইসলামের অমূল্য ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী (সা.) এবং নিষ্পাপ ইমামগণ খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমীরুল মুমিনীন (আ.) ঘোষণা করেছেন : 'বিবাহ কর, কারণ, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুসরণ করতে চায় সে জেনে রাখুক, বিবাহ হচ্ছে সেগুলোর অন্যতম।'[৩]

---

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'বিবাহ আমার সুন্নাত এবং যে কেউ আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে সে আমার থেকে নয়।'[১]

ইসলাম বিবাহ এবং সন্তান জন্মদানকে পাশবিক কাজ মনে করে না এবং এর অনুসারীদেরকে সন্ন্যাস জীবন যাপন এবং বিবাহ পরিত্যাগ করার আদেশ দেয় না; বরং একে আত্মপরিশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নতি, পাপ থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করে। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'একজন বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাকাত নামায একজন অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকাত নামাযের চেয়েও শ্রেয়।'[২]

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'একজন বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাকাত নামায একজন অবিবাহিত ব্যক্তির সেই ইবাদতের চেয়ে শ্রেয় যে নামায পড়ায় তার রাত অতিবাহিত করে এবং রোযা রেখে দিন অতিবাহিত করে।'[৩]

ইমাম সাদিক (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন : 'তোমাদের মৃতদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই যে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়।'[৪]

ইসলাম ধর্ম অনুসারে বিবাহ এবং পরিবার গঠন করা খুবই মূল্যবান এবং এর অনেকগুলো উপকারিতা রয়েছে যার কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হলো :

১. ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের উপকরণ

এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনে মানুষের জন্য শান্তি, স্থিরতা ও ভালোবাসার প্রয়োজন। আমাদের সকলেরই একজন নির্ভরশীল সহানুভূতিসম্পন্ন, বিশ্বস্ত বন্ধু, সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী প্রয়োজন যাকে আমরা ভালোবাসতে পারি এবং প্রতিদানে তার একনিষ্ঠ ভালোবাসা, সাহায্য ও সমর্থনকে উপভোগ করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের একজন ব্যক্তির প্রয়োজন যে আমাদের জীবনের অংশীদার হতে পারে– এমন ব্যক্তি

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২২০
২. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

যে হবে অনুগত, দয়ালু এবং সুস্থতায় ও অসুস্থতায়, উন্নতিতে এবং কঠিন অবস্থায়, সুখে-দুঃখে, প্রাচুর্যে ও দারিদ্র্যে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল।

এই প্রয়োজন পূরণে একটি দম্পতির চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে এবং পরিবারের উষ্ণ সহানুভূতিশীল স্থান অপেক্ষা আর কোন স্থান এর চেয়ে উত্তম হতে পারে? মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি হল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্র্য ও অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।[১]

২. আত্মসংযম ও পাপ থেকে বিরত থাকার উপকরণ

মানুষের স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক ও যৌন নিবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে। যৌন কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করা হলো চ্যালেঞ্জিং; যদি তা বৈধ উপায়ে পরিতৃপ্ত করা না হয় এবং তা একজন মানুষকে বিচ্যুত ও পাপে লিপ্ত করে। তাই স্বাভাবিক যৌন কামনা নিবৃত্তি এবং বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিবাহ হলো সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে পবিত্র এবং নিষ্পাপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চায় সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে।'[২]

মহান ইমাম সাদিক (আ.) মহানবী (সা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন : 'যে বিবাহ করল, সে তার ধর্মের অর্ধেক হেফাজত করল।'[৩]

---

১. সূরা রূম : ২১
২. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৮
৩. প্রাগুক্ত, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৭

ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.) তাঁর পূর্বপুরুষ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "যখন কোন ব্যক্তি যৌবনে বিবাহ করে তখন তাদের শয়তান ক্রন্দন করে– 'হায় আফসোস আমার জন্য! আফসোস আমার জন্য! এই যুবক তার ধর্মের এক তৃতীয়াংশকে আমার থেকে সুরক্ষিত করে ফেলল।' তাই অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের জন্য সেই ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর অনুগত বান্দা হবে।'[১]

৩. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপকরণ

যৌন কামনা এবং তা নিবৃত্তি হলো স্বাভাবিক চাহিদা যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দেয়। এ প্রয়োজনগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও দমন মানুষের মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে এবং তার ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। নানা ধরনের মানসিক বৈকল্য, যেমন বিষণ্নতা, বিষাদগ্রস্ততা, হতাশা, দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, ব্যর্থতার কারণে নৈরাশ্যবোধ, নাস্তিবাদ, অবিশ্বাস এবং ক্রোধ যৌন প্রবৃত্তিকে দমনের ফলে হতে পারে। সুতরাং সময়মতো বিয়ে ও যৌনতৃপ্তি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মহানবী (সা.) বলেছেন : 'তোমাদের অবিবাহিত পুরুষ ও নারীকে সময়মতো বিয়ে দাও এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের আচরণ উন্নত করবেন, জীবিকা বৃদ্ধি করবেন এবং তাদের মনুষ্যত্বকে বৃদ্ধি করবেন।'

৪. সামাজিক পরিবেশের কল্যাণ

যদি প্রত্যেকে সাবালক অবস্থায় বিয়ে করে তাহলে সে পরিবারকে ভালোবাসবে এবং তাদের পরিবারের ওপর নির্ভর করবে এবং অনেক ধরনের নৈতিক স্খলন ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকবে। এর ফলে ধর্ষণ, মেয়ে ও নারীদের থেকে অবৈধ সুবিধা নেয়া, জেনা, সমকামিতা, হস্তমৈথুন, এমনকি নেশাগ্রস্ততা, হত্যা, চুরি ও অন্য অনেক অপরাধ হ্রাস পাবে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তার ওপর সময়মতো বিয়ের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এই কারণে ইসলাম পিতামাতা এবং প্রতিপালনকারীকে যারা এখনও

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২২১

বিয়ে করে নি তাদেরকে বিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে উপদেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআন বলছে :

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

তোমাদের অবিবাহিত ব্যক্তিদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত তাদের সকলের বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ কর; তারা যদি অভাবগ্রস্তও হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করবেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন :

একজন পিতার তার সন্তানের প্রতি তিনটি কর্তব্য রয়েছে : সে তার জন্য উত্তম নাম রাখবে, তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেবে এবং যখন তারা সাবালক হবে তখন তাদেরকে বিয়ে দেবে।[২]

৫. সন্তান জন্মদান

ইসলাম সন্তান জন্মদানকে পছন্দ করে এবং একে বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইমাম জাফর (আ.) মহানবী (সা.) থেকে উদ্ধৃত করেন : 'কোন্ বিষয়টি একজন মুমিনকে সহধর্মী/সহধর্মিণী গ্রহণে বাধা দেয়? হতে পারে যে, আল্লাহ তাকে একটি সন্তান দেবেন যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (একত্ববাদের সাক্ষ্য– আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) দ্বারা পৃথিবীকে সজীব করবে।[৩]

মহানবী (সা.) বলেন : বিয়ে কর যাতে তোমরা বৃদ্ধি পেতে পার। কারণ, নিশ্চয়ই আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের নিয়ে উম্মতসমূহের মধ্যে গর্ব করব, এমনকি (তোমাদের) গর্ভপাতসমূহ (হিসাব করা হবে)।'[৪]

---

১. সূরা নূর : ৩২
২. মাকারিমুল আখলাক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩
৩. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৪
৪. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২২০

৬. উপভোগ ও যৌনসম্ভোগ

বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো বৈধভাবে যৌনবাসনা নিবৃত্তি ও পরিতৃপ্তি। যৌনকার্য অন্যতম পার্থিব সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি আনয়ন করে এবং ইসলাম অনুসারে তা কেবল ভদ্র, মার্জিত ও বৈধ কর্মই নয়; যদি তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা এমন উত্তম কর্ম যার জন্য পুণ্য অর্জিত হয়। উপরন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্ক বাধ্যতামূলক (ফরয) হয়ে যায়।

বিবাহ চুক্তির শর্তসমূহ

বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি, যা কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায়–

১. পুরুষ ও নারীর সম্মতি;
২. নারীর পিতা বা দাদার অনুমতি (যদি নারীর পূর্বে বিবাহ না হয়ে থাকে);
৩. মোহরানা[১] নির্ধারণ করা (মোহর হতে পারে বাড়ি, নগদ, বাকি, অথবা অন্য যে কোন প্রকার সম্পদ)– বিপুল পরিমাণে অথবা অল্প পরিমাণে।
৪. বিবাহের সিগাহ উচ্চারণ করা (বিবাহের শপথ) : নারী বা পুরুষ অথবা তাদের প্রতিনিধি– এমন কেউ যে ব্যক্তি আরবি ভাষায় স্বচ্ছন্দ।

নারী-পুরুষের বিবাহের সিগাহর উচ্চারণ করার পর নারী ও পুরুষের ব্যক্তিক জীবনসমূহ পারিবারিক জীবনে রূপান্তরিত হয় এবং অতঃপর পুরুষ ও নারী নতুন দায়িত্ব লাভ করে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

ইসলাম ধর্ম অনুসারে, পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্র একক যা সমাজকে গঠন করে। এই ক্ষুদ্র একক গড়ে ওঠে একজন নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে এবং সন্তান-সন্ততি জন্মদানের মাধ্যমে তা সম্প্রসারিত হয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

১. মোহর হলো একটি নির্ধারিত পরিমাণ জিনিস যা কেবল পুরুষকে তার স্ত্রীকে অবশ্যই বিয়ের উপহার হিসেবে দিতে হয়।

রয়েছে এবং অভিন্ন লক্ষ্য ও স্বার্থ রয়েছে। প্রত্যেক সদস্যের সুখ পরিবারের সুখের ওপর নির্ভর করে।

বিয়ের পর একজন পুরুষ ও একজন নারী অবশ্যই পরিবারের সকল সদস্যকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা হিসেবে মনে করবে না। একজন স্বামী ও একজন স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্কের ন্যায় নয়; ঐক্যের বন্ধনের দৃষ্টিতে এটি আরো গভীর। পবিত্র কোরআন এটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে–

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি হল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্র্য ও অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।[১]

এই বাণী বা বক্তব্য 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন'– সংযুক্ততা ও সম্পর্কের গভীরতা নির্দেশ করে।

আরেকটি আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী সম্পর্কে কোরআন বলছে :

...هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ...

...স্ত্রীরা তোমাদের বসন এবং তোমরা তাদের বসন...[২]

স্ত্রী ও স্বামী একে অপরের বসন– এ কথাটি তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে, যেহেতু কাপড় হলো কারো শরীরের সবচেয়ে নিকটবর্তী বা ঘনিষ্ঠ বস্তু এবং তাকে গরম ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করা, তার অপূর্ণতাকে ঢেকে রাখা এবং প্রশান্তি ও সৌন্দর্য দান করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের ক্ষেত্রে এমনই এবং অবশ্যই এমন হওয়াই উচিত।

১. সূরা রূম : ২১
২. সূরা বাকারা : ১৮৭

ইসলাম পরিবারের কাঠামোকে দৃঢ়ীকরণ এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথাযথ সম্পর্ককে সুনজরে দেখে। আর তাই ইসলাম প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট কিছু অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। এই সকল অধিকার ও দায়িত্বকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় : অভিন্ন এবং বিশেষ। এই উভয় ভাগকে নিম্নোক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়–

অভিন্ন অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

যেসব অধিকার ও দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো হলো :

১. বন্ধুভাবাপন্নতা

স্ত্রী ও স্বামী একে অপরের সাথে অবশ্যই যথাযথ ব্যবহার করবে এবং সুন্দর আচরণ করবে। কোরআন ঘোষণা করছে : وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তাদের সাথে সদাচার করতে থাক...'[১]

এই বাক্যে যে 'মারুফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা 'মুনকার' (মন্দ) এর বিপরীত এবং এর অর্থ এমন আচার-ব্যবহার যা যুক্তিসঙ্গত ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত। যদিও এই আয়াতে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রেও এই সকল বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই দয়ালু, ভদ্র স্বভাববিশিষ্ট, আন্তরিক, হর্ষোৎফুল্ল, সহমর্মী, সাহায্যকারী, সহানুভূতিশীল, বিনীত, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সমর্থনকারী, বিশ্বস্ত, অনুগত, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং একে অপরের প্রতি নম্র হবে। অনেক হাদিস বন্ধুভাবাপন্নতা ও উদারতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের নবী (সা.) বলেছেন : মুমিনদের মধ্যে বিশ্বাসে সবচেয়ে পূর্ণ সেই ব্যক্তি যার আচরণ সবচেয়ে উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।'[২]

২. স্বামী বা স্ত্রীর অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করা

স্বামী ও স্ত্রী অবশ্যই পরিচ্ছন্নতা, পোশাক, তাদের চুল ও দাড়ির স্টাইল ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ইসলাম নারীদেরকে ঘরের মধ্যে

১. সূরা নিসা : ১৯
২. বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯

তাদের স্বামীদের জন্য প্রসাধনী ও সাজসজ্জা ব্যবহার করা, সবচেয়ে ভালো কাপড় পরিধান করা, পরিষ্কা-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দেয়। ইমাম সাদেক (আ.) বলেন : একজন নারী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল : 'স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারগুলো কী কী?' তিনি জবাব দিলেন : 'তার কর্তব্য হলো তার সুগন্ধিগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালোটি দিয়ে নিজেকে সুগন্ধিযুক্ত করা, তার পরিচ্ছদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দরটি পরিধান করা, তার অলংকারগুলোর মধ্য থেকে সবেচেয়ে সুন্দরটি দিয়ে নিজেকে অলংকৃত করা এবং নিজেকে তার কাছে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থাপন করা। আর তার (স্ত্রীর) ওপর তার অধিকার এর চেয়েও বেশি।'[১]

একজন স্বামীরও তার স্ত্রীর প্রতি এইসব দায়িত্ব রয়েছে: তাকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, সুগন্ধি মাখতে হবে এবং উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করতে হবে, তাকে অবশ্যই চুল ও মুখমণ্ডল স্টাইল করতে হবে, তার স্ত্রীর জন্য নিজেকে সুশ্রী করতে হবে। ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে মহানবী (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

'তোমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই নিজেদেরকে স্ত্রীদের জন্য প্রস্তুত করতে হবে; ঠিক যেমনভাবে তোমাদের স্ত্রীরা তাদেরকে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে।' এরপর ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'এর অর্থ হলো, তোমাদের প্রত্যেকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।'[২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'স্বামীর ওপর একজন স্ত্রীর অধিকার হলো যে, সে তার ভরণপোষণ দেবে, খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে এবং কুৎসিত চেহারায় তার সামনে উপস্থিত হবে না; যদি সে এগুলো করে, আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই সে তার অধিকারকে আদায় করেছে।'[৩]

হাসান ইবনুল জাহম বলেন : "আমি মূসা ইবনে জাফর (আ.)-কে দেখলাম তিনি চুলে রং করিয়েছেন। আমি বললাম : 'আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত হই। আপনি আপনার চুলে রং করিয়েছেন।' তিনি জবাব দিলেন : 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই একজন স্বামীর

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৫৮
২. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৯৬
৩. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫৪

তার স্ত্রীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা তার (স্ত্রীর) নিষ্ঠতাকে বৃদ্ধি করে। নিশ্চয়ই কিছুসংখ্যক নারী তার নিষ্ঠতাকে পরিত্যাগ করেছে তাদের স্বামীদের প্রস্তুতিকে পরিত্যাগ করার কারণে।' তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কি তোমার স্ত্রীকে সেভাবে দেখতে পছন্দ কর যেভাবে তুমি তার সামনে উপস্থিত হও যখন তুমি নিজেকে প্রস্তুত কর নি?' আমি জবাব দিলাম : 'না।' তিনি বললেন : 'সে একই রকম অনুভব করে'।"[১]

৩. উপভোগ ও পরিতৃপ্তি

যদিও বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য যৌন সুখ কামনা ও যৌন পরিতৃপ্তি নয়, তবুও এটি বিয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং বিয়ের প্রাথমিক উদ্দীপকও বটে এবং পরিবারের কাঠামো শক্তিশালী করা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সুতরাং পরিতৃপ্ত করা স্বামী ও স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব। স্বামী ও স্ত্রীকে অবশ্যই পরস্পরকে যৌন পরিতৃপ্তি দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। যখন এক পক্ষ যৌন কামনার জন্য উদ্যত হয় তখন অপরজন অবশ্যই নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করবে এবং কোন অজুহাত দেখাবে না। মহানবী (সা.) নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে– 'তোমাদের স্বামীদেরকে (যৌন কামনা হতে) বিরত রাখতে তোমরা নামাযকে দীর্ঘায়িত কর না।'[২]

ভালোবাসার ক্ষেত্রে (যৌনতৃপ্তি) ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী অবশ্যই শুধু নিজেদের পরিতৃপ্তির দিকটি চিন্তা করবে না; বরং তারা অবশ্যই তাদের অংশীদারের আনন্দ ও পরিতৃপ্তির বিষয়টিও বিবেচনা করবে। এটা এ কারণে যে, দম্পতির মধ্যে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং পরিবারের বন্ধনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নিয়মিত যৌন পরিতৃপ্তির গুরুত্বপূর্ণ ফল রয়েছে। পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেন : 'যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর সান্নিধ্যে যায় তখন যেন সে তাড়াহুড়া না করে (যৌনকার্যের ক্ষেত্রে)।'[৩]

---

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২৪৬
২. প্রাগুক্ত, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৬৪
৩. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২২১

ইমাম রেযা (আ.) বলেন : 'তোমার স্ত্রী তোমার কাছ থেকে সেটাই আশা করে যা তুমি তাদের কাছ থেকে আশা কর।'[১]

৪. সন্তান-সন্ততির লালন-পালন

সন্তানদের জন্য যত্নশীল হওয়া, তাদের সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা, শরীর ও মনের প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান ও নৈতিকতা শিক্ষা দান হলো পিতামাতার অভিন্ন দায়িত্ব। এর জন্য তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা, ইচ্ছা এবং একনিষ্ঠতার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পিতার বৃহত্তর দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু মাতার দায়িত্ব অধিকতর সংবেদনশীল ও গঠনমূলক।

স্বামী ও স্ত্রীর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. স্বামীর বাধ্যবাধকতা

স্বামী-স্ত্রীর অভিন্ন দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের স্বতন্ত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য পুরুষের ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব রয়েছে, তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. পরিবারের তত্ত্বাবধান

ইসলামে পরিবারের অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রশংসিত আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

পুরুষরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল (কর্তৃত্বের অধিকারী) এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের কতককে (পুরুষকে) কতকের (নারীর) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা (নারীদের জন্য) তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে। সুতরাং

১. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২২১

সৎকর্মশীল নারীরা (স্বামীদের) অনুগত হয়ে থাকে এবং যা কিছু আল্লাহ (তাদের জন্য) সংরক্ষণ করেছেন তারা (তাদের স্বামীদের) অনুপস্থিতিতে তার সংরক্ষণকারী।[১]

পরিবারের বিষয়াদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতা, পরামর্শ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে। অন্য সমাজের মতোই এই ছোট সমাজও একজন দূরদর্শী ও প্রভাবশালী তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক ছাড়া ভালোভাবে চলতে পারে না। যেসব পরিবারে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবস্থাপকের ঘাটতি রয়েছে সেসব পরিবার কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় নেই। সুতরাং হয় স্ত্রীকে পরিবারের তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে অথবা স্বামীকে।

আবার পুরুষ ও নারীর বিশেষ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে, যেমন সাধারণত অধিকাংশ পুরুষ নারীর চেয়ে আবেগের বিপরীতে অধিকতর যুক্তিবাদী, পরিবারের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য অধিকতর উপযুক্ত এবং কঠিন অবস্থা সহ্য করার ব্যাপারে অধিকতর উত্তম হওয়ায় পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নারী হলো পুরুষের তুলনায় অধিক আবেগপ্রবণ ও ধৈর্যশীল। সুতরাং পরিবারের সর্বোচ্চ লাভের জন্যই নারী পুরুষের তত্ত্বাবধানকে মেনে নেবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ স্বামীর সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করবে। আর মতভিন্নতার ক্ষেত্রে স্বামীর মতকে মেনে নেবে।

এটি অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুরুষের তত্ত্বাবধানের অর্থ এটা নয় যে, পুরুষ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বার্থপরভাবে পরিবার পরিচালনা করবে এবং যা খুশি তা-ই করবে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে তাদের অভিমত ব্যক্ত করায় বাধা দেবে। এটা এ কারণে যে, একজন দূরদর্শী ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক খুব ভালোভাবে জানে যে, কোন প্রতিষ্ঠানই– তা ছোট হোক বা বড়, বল প্রয়োগ ও স্বার্থবাদী চিন্তার মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে না, বিশেষ করে এই বাস্তবতার দৃষ্টিতে যে, বাড়ি হবে সুখ-শান্তির স্থান এবং সন্তানদের প্রতিপালনের স্থান– যারা সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। এই বাস্তবতায় পুরুষের তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিবারের পরিচালনার জন্য প্রথম ও অগ্রাধিকারযুক্ত বিষয় হলো সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এই পরিকল্পনাসমূহ অবশ্যই পরিবারের অপরাপর সদস্যের সাথে পরামর্শ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে হতে হবে এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়টি তাদের সহযোগিতায়

১. সূরা নিসা : ৩৪

বাস্তবায়িত হবে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং সর্বশেষে মতভিন্নতার ক্ষেত্রে পুরুষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।

পুরুষের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বসমূহকে সংক্ষেপে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

ক. পরিবারের খরচেয়ে যোগান দেয়া, পরামর্শের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবারের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থাপনা করা;
খ. পরিবারের সদস্যদের প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও লালন-পালন করা;
গ. পরিবারের সদস্যদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদির দিকে লক্ষ্য রাখা, আত্মিক ও শারীরিক উন্নতির দিকে তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান এবং পরিবারের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক অনাচারকে প্রতিরোধ করা।

২. অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান (নাফাকাহ)

ইসলামে পরিবারের জীবন যাপনের যাবতীয় ব্যয় বহন করার দায়িত্ব পুরুষের। ইসহাক ইবনে আম্মার ইমাম সাদিক (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'একজন স্ত্রীর তার স্বামীর ওপর কী কী অধিকার রয়েছে?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন : ' সে তার উদরকে তৃপ্ত করবে (খাবারের ব্যবস্থা) করবে, পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করবে এবং যদি সে ভুল করে তাহলে তাকে ক্ষমা করবে।'[১]

৩. সম্মান, ভদ্রতা এবং কোমলতা

একজন পুরুষ অবশ্যই তার স্ত্রীর প্রশংসাকারী হবে এবং তাকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ (উপহার) হিসেবে গণ্য করবে। সে অবশ্যই তাকে সম্মান করবে, তার সাথে ভদ্র আচরণ করবে, তার ভুলত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করবে এবং কঠোরতা ও একগুঁয়েমি মনোভাব হতে বিরত থাকবে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'স্ত্রীর অধিকারসমূহ হলো এই যে, তুমি অবশ্যই জানবে, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন শান্তি ও বন্ধুত্ব (এর উপকরণ হিসেবে); তারপর তুমি অবশ্যই জানবে যে, সে তোমার ওপর আল্লাহর নিকট থেকে অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি তাকে সম্মান করবে এবং তার সাথে ভদ্র ও নমনীয় হবে। যদিও তার ওপরও তোমার অধিকারসমূহ রয়েছে, তবু তুমি অবশ্যই তার প্রতি দয়ালু এবং ক্ষমাশীল

১. মাকারিমুল আখলাক, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮

হবে। কারণ, সে তোমার কাছে বন্দি। আর তুমি অবশ্যই তাকে খাবার ও পোশাক দেবে এবং যখন সে ভুলত্রুটি করবে, তুমি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করবে।'[১]

৪. ধর্মীয় ও নৈতিক পথনির্দেশনা প্রদান

পুরুষ তাদের স্ত্রীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও চিন্তা-বিশ্বাসগত বিষয়াদির ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে বাধ্য। হয় তারা নিজেরাই তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে অথবা তারা তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। একজন পুরুষকে অবশ্যই তার স্ত্রীর নৈতিকতা ও আচরণের ব্যাপারে যত্নশীল থাকতে হবে। সে তাকে সৎকর্ম ও প্রশংসনীয় আচরণের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে এবং মন্দকর্ম ও অভদ্র ও অমার্জিত আচরণ থেকে বিরত রাখবে। সংক্ষেপে বলা যায়, সে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখবে এবং তাকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করবে।

এটি তত্ত্বাবধান করার অন্যতম ফল এবং আবশ্যক বিষয়– যা পুরুষের দায়িত্ব। কোরআন ঘোষণা করছে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে এমন আগুন হতে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর...[২]

খ. নারীদের বাধ্যবাধকতা

নারীরও তার স্বামীর প্রতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো কয়েকটি হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে। এই সকল দায়িত্বকে একটি মাত্র বাক্যে এভাবে প্রকাশ করা যায় : আর তা হলো : উত্তমভাবে স্বামীর যত্ন নেয়া। আমীরুল মুমিনীন (আ.) বলেছেন : 'নারীর জিহাদ হলো উত্তমভাবে তার স্বামীর যত্ন নেয়া।'[৩]

১. বিহারুল আনওয়ার, ৭৪তম খণ্ড, পৃ. ৫
২. সূরা তাহরীম : ৬
৩. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫২

এই হাদিসে এই শব্দ 'উত্তমভাবে স্বামীর যত্ন নেয়া' একটি সংক্ষিপ্ত টার্ম হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু এর একটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে এবং তা সকল সৎকর্মকে শামিল করে। যে নারী তার স্বামীর উত্তম যত্ন নেয় তার সম্পর্কে বলা যেতে পারে :

সে তার স্বামীর তত্ত্বাবধান ও পরিচালনাকে মেনে নেয় এবং সেটাকে রক্ষা ও সমর্থন করে। সে পরিবার ও সন্তানদের কাছে তার স্বামীর মর্যাদাকে হেফাজত করে। সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে। সে তার নির্দেশ মেনে চলে। যদি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী মনে করে যে, স্ত্রীর ঘরের বাইরে যাওয়া অবিবেচনামূলক এবং তাকে অনুমতি না দেয় তাহলে সে বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়। উত্তম ব্যবহার, সদাচরণ এবং দয়ার মাধ্যমে সে স্বামীকে উৎসাহ দেয় এবং তার গৃহকে একটি প্রশান্তি ও ভালোবাসার কেন্দ্রে পরিণত করে। সমস্যায় ও কঠিন সময়গুলোতে সে তার স্বামীকে সহযোগিতা করে এবং তাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেয়। সে তার সম্পদের বিশ্বস্ত আমানতদার এবং সম্পদ নষ্ট, অপচয় এবং অপব্যয় পরিহার করে। সে তাকে ভালো কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। বাড়িতে সে তার সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করে, সে তাকে সজ্জিত করে এবং স্বামীর পছন্দমতো প্রসাধনী ব্যবহার করে এবং সে সবসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার ইচ্ছা ও আসক্তি প্রদর্শন করে। সে গৃহস্থালি কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এবং সন্তান-সন্ততিকে উত্তমভাবে প্রশিক্ষণ দেয়। সে তার স্বামীর গোপনীয়তার রক্ষক, আমানতদার, প্রেমময়, সহমর্মী ইত্যাদি।

এই রকম নারীর ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, সে তার স্বামীর উত্তম যত্ন নেয় এবং তার কাজকর্ম হলো পবিত্র জিহাদের সমান।

হাদিসে কয়েকটি বিষয়ে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে :

১. ধর্মীয় অনুমোদিত বিষয়ে স্বামীকে মান্য করা;
২. নিজেকে স্বামীর কাছে সঁপে দেয়া– একসাথে শোয়া, শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন (যেসব ক্ষেত্রে ধর্ম নিষেধ করেছে সেসব ক্ষেত্র ব্যতীত) এবং ভালোবাসা;
৩. বিশ্বস্ততা ও স্বামীর সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে আমানতদারি;
৪. ভদ্রতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ;
৫. বাড়ির বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট থেকে অনুমতি নেয়া।

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর পিতা থেকে মহানবী (সা.)-এর বাণী উদ্ধৃত করেছেন : 'কোন মুসলিম পুরুষই মুসলমান হওয়ার পরে একজন মুসলিম স্ত্রীর মাধ্যমে যতটুকু লাভবান হয়েছে অন্য কিছুতে তত লাভবান হয় নি– যখন সে তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সুখের অনুভূতি দান করে এবং যখন সে তাকে কোন আদেশ দেয় তখন তা মান্য করে এবং যখন সে অনুপস্থিত থাকে তখন নিজের ও তার সম্পদে হেফাজত করে।'[১]

ইমাম বাকের (আ.) বলেন : 'একজন নারী মহানবী (সা.)-এর কাছে এল এবং বলল : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন পুরুষের তার স্ত্রীর ওপর কী কী অধিকার রয়েছে?' তিনি জবাব দিলেন : 'সে তাকে অবশ্যই মান্য করবে, তার অবাধ্য হবে না, সে তার অনুমতি ছাড়া তার বাড়ি থেকে দান-খয়রাত করবে না। সে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা করবে না। সে তার সাথে মিলিত হতে অস্বীকার করবে না যদি সে উটের পিঠেও থাকে এবং সে তার অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না।'[২]

নারীর মোহরানা ও এর দর্শন

নারীর মোহরানা

যখন বিবাহের শপথ পাঠ করা হয় তখন স্বামী তার স্ত্রীকে একটি উপহার দেয় যাকে 'মোহরানা' বা 'সাদাক' বলা হয়। মোহর শব্দটি পবিত্র কোরআনে দেখা যায় না, যেখানে সাদাক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোরআন বলছে :

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

এবং নারীদের তাদের দেনমোহর স্বেচ্ছায় প্রদান কর; যদি তারা তার থেকে কিছু অংশ তোমাদের স্বেচ্ছায় প্রদান করে তবে তা সানন্দে ভোগ কর।[৩]

---

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৪১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৩. সূরা নিসা : ৪

সাদাকের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় নি– এটি এমন একটি বিষয় যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। ইমাম বাকের (আ.) বলেন : 'সাদাক হলো এমন কিছু যা বাগদত্ত ও বাগদত্তা সম্মত হয়– কম বা বেশি।'[১]

মোহরের জন্য কোন সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা হয় নি যদিও অনেক হাদিসে অধিক কম না করার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর প্রপিতামহ ইমাম আলী (আ.) থেকে উদ্ধৃত করেন : 'আমি দশ দিরহামের কম মোহরানা অপছন্দ করি, যাতে তা পতিতার মূল্যের সদৃশ না হয়।'[২]

উপরন্তু, সাদাক এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা নেই। যদিও উচ্চ মোহরানা নিষিদ্ধ নয়, তবু ইসলাম উচ্চ মোহরানা নির্ধারণ করে না এবং মোহরানা নির্ধারণে প্রতিযোগিতা করাকে দূরদর্শী বা সুচিন্তিত বলে মনে করে না এবং এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছে।

আমীরুল মুমিনীন (আ.) ঘোষণা করেছেন : নারীর মোহর কম করে নির্ধারণ করো না আবার অতিরিক্ত নির্ধারণে প্রতিযোগিতা কর না। কেননা, তা শত্রুতা সৃষ্টি করে।'[৩]

আমরা অবশ্যই মোহরানা নির্ধারণে একেবারে আপোসহীন হব না। কারণ, তা যুবকদের বিবাহের বিষয়টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমরা অবশ্যই অতিরিক্ত মোহরানা নির্ধারণ হতে দূরে থাকব এবং একটি যথাযথ ও মানানসই মোহরানা নির্ধারণ করব যা হবু দম্পতির অবস্থার সাথে, তাদের পরিবারের সামাজিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং হবু স্বামীর অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

উপরন্তু, মোহরানার প্রকৃতির ব্যাপারে কোন সীমাবদ্ধতা নেই– এটি যে কোন ধরনের জিনিস হতে পারে– যেমন, সোনা, রুপা, জমি, মুদ্রা, গৃহস্থালি সামগ্রী, কার্পেট, তৈজসপত্র, গাড়ি, পোশাক এবং অন্য যে কোন জিনিস যার মালিকানা অর্জন করা সম্ভব। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে নারী তার লাভের জন্য জমি, সোনা, রুপা এবং এজাতীয় জিনিসকে তার মোহরানা হিসেবে ধার্য করতে পারে। এটা এজন্য যে,

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২৪০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

এগুলোর মূল্য (সচরাচর) সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পায় না এবং তার জন্য সঞ্চয় হিসেবে থাকতে পারে।

মোহরানা তাৎক্ষণিক প্রদত্ত হতে পারে অথবা বাকি হিসেবে থাকতে পারে। এই দায়িত্ব স্বামীর অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির হতে পারে যে তা পরিশোধের জন্য সম্মত হয় এবং তা দম্পতির পারস্পরিক সম্মতির ওপর নির্ভর করে।

যদি মোহরানা চাওয়ামাত্র পরিশোধের ব্যাপারে সম্মতি দেয়া হয়, তাহলে নারী তার বিবাহ সম্পাদন হওয়ার পূর্বেই তা পরিশোধের অনুরোধ জানাতে পারে। যদি স্বামীর তা পরিশোধের উপায় থাকে, তাহলে তাকে তা পরিশোধ করতে হবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী যৌনসম্পর্ক স্থাপন হতে বিরত থাকতে পারে। এই প্রত্যাখ্যান 'নুসূয'[১] হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং তার স্বামী তার অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থগিত করতে পারবে না।

যদি মোহরানা বাকি বা ধার হিসেবে হয় এবং যদি পরিশোধের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত হয় তাহলে নারী সেই সময়ের পূর্বে তা দাবি করতে পারবে না এবং যদি কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়ে না থাকে তাহলে স্ত্রী যে কোন সময়ে তা চাইতে পারে। যদি স্বামীর তা দেয়ার উপায় থাকে তাহলে স্বামীকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে তা দিতে হবে।

মোহরানার প্রকৃত মালিক হলো স্ত্রী, তা যে কোন প্রকারের সম্পদ-সম্পত্তি হোক না কেন। তার সম্মতি ছাড়া তার সম্পত্তি ব্যবহার বা দখলে নেয়ার অধিকার কারো নেই– এমনকি তার পিতা-মাতা অথবা তার স্বামীরও নেই। নারীর সম্পত্তির মুনাফাও তার অধিকারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পুনরুত্থান দিবসে যে কোন পাপ ক্ষমা করে দেবেন কেবল তার পাপ ব্যতীত– যে নারীর মোহরানার অপব্যবহার করে অথবা ভাড়া করা কোন ব্যক্তির মজুরি আত্মসাৎ বা অপব্যবহার করে অথবা যে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে (দাস হিসেবে)।'[২]

১. যখন দম্পতি তাদের পরস্পরের প্রতি আবশ্যিক দায়িত্ব পালন করে না
২. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, পৃ. ২৬৬

ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় : 'কোন পিতা কি তার কন্যার মোহরানা ভোগ করতে পারে?' তিনি জবাব দিলেন : 'না, তার এমন কোন অধিকার নেই।'[১]

যদি মোহরানা বাকিতে পরিশোধযোগ্য হয় এবং পরিশোধের দায়িত্ব স্বামীর হয় তাহলে সে অবশ্যই চাওয়ামাত্র তা দেবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব দেবে।

যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে, কিন্তু তাকে মোহরানা দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না তার সম্পর্কে ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'এটি জেনা (হিসেবে গণ্য)।'[২]

ইমাম সাদিক (আ.) আরো বলে : 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মোহরানা প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল, কিন্তু তাকে সম্মান দিতে চায় না, সে হলো চোরের মতো।'[৩]

মহান ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর প্রপিতামহ মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন : 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মোহরানার ব্যাপারে জুলুম করে সে আল্লাহর কাছে জেনাকার হিসেবে গণ্য। বিচার দিবসে সম্মানিত ও প্রশংসিত আল্লাহ তাকে বলবেন : 'হে আমার বান্দা! আমি আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার বান্দাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর তুমি আমার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলে না এবং আমার বান্দাকে অত্যাচার করেছ। সুতরাং তিনি তার সৎকর্ম ও পুণ্য থেকে সেই পরিমাণে নিয়ে নেবেন যতটুকু তার (স্ত্রীর) অধিকার এবং সেগুলো তাকে দিয়ে দেবেন আর যদি তার কোন পুণ্যকর্ম না থাকে তাহলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেবেন। কারণ, সে তাঁর প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করে নি এবং নিশ্চয়ই প্রত্যেকে তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৪]

মোহরের দর্শন

কেউ মোহরানার বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে এবং বলতে পারে : পুরুষ ও নারীর শারীরিক ও প্রবৃত্তিগতভাবে পরস্পরকে প্রয়োজন। এই কারণে তারা একে অপরের

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
৪. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, পৃ. ২৭৬

প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরিণতিতে বিয়ে করে। এই দিকটি বিবেচনা করলে মেহারানার কারণ কী? মোহরানার বিধানের মাধ্যমে নারীকে একটি ব্যবসায়িক পণ্যের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। পুরুষ মোহরানার মাধ্যমে একজন নারীকে ক্রয় করে যেভাবে কেউ দাস ক্রয় করে।'

উত্তরে অবশ্যই এটা বলা যায় যে, ইসলামে নারীকে পণ্য বা দাস কোনটিই গণ্য করা হয় না আর মোহরানাও পণ্যমূল্য মনে করে না। বরং মোহরানা হলো একটি উপহার যা একজন স্বামী তার স্ত্রীকে প্রদান করে তাকে সম্মান করা এবং তার প্রতি নিবেদিত থাকার অভিব্যক্তি হিসেবে।

এই বিষয়টি প্রকাশ করা এবং মোহরানার দর্শন ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি বিষয় আলোচনা করা হল :

প্রথম বিষয় : যদিও নারী ও পুরুষের শারীরিকভাবে পরস্পরকে প্রয়োজন এবং প্রকৃতিগতভাবে একে অপরকে কামনা করে, কিন্তু তাদের উভয়ের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে–

নারীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাদের কোমলতা এবং সৌন্দর্যের মধ্যে যেটি তাদের প্রতি পুরুষের আকর্ষণের একটি কারণ। নারীর প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো তাদের সৌন্দর্য– এটি এমন বিষয় যার জন্য পুরুষের অনন্য মনোযোগ রয়েছে।

একজন নারী প্রকৃতিগতভাবেই এটি বোঝে আর তাই আরো অধিক সুন্দর দেখানোর জন্য এবং পুরুষের অন্তরের আরো গভীরে প্রবেশের লক্ষে সৌন্দর্যের নানা উপকরণ ও অলংকার ব্যবহার করে।

নারীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, যদিও তাদের পুরুষের মতোই যৌন চাহিদা রয়েছে; কিন্তু তারা প্রবৃত্তির কামনাকে অবদমিত করার ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী। মনে হয় তারা যেন কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত এবং সাধারণত তারা পুরুষকে প্রস্তাব করে না। একজন নারী পুরুষের হৃদয়কে অভিভূত করতে এবং তার প্রতি পুরুসের প্রেমমুগ্ধ হওয়াকে পছন্দ করে যাতে তাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেয়। নারীর মেকআপ, প্রেমের ভান এই বিষয় থেকে উৎপত্তি লাভ করে। তাই একজন নারী পুরুষের

অন্তরকে গভীরভাবে আকর্ষণ করতে চায় এবং তার ভালোবাসা ও গভীর অনুরক্তি পেতে চায়।

যেখানে পুরুষ তার কামনা-বাসনার বিপক্ষে দুর্বল এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ভাবাবেগকে চেপে রাখতে পারে না। এই কারণে তারা নারীকে প্রস্তাব দেয়। পুরুষ নারীকে ভীষণভাবে কামনা করে এবং তাদের পেছনে ছোটে। যখন একজন পুরুষ বুঝতে পারে যে, একজন নারী তার ভালোবাসা কামনা করে, তখন সে তার ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং তার লজ্জা ও লাজুকতাকে স্বাগত জানায়। তার ভালোবাসার প্রমাণ দেয়ার জন্য সে প্রয়োজনীয় সবকিছু করে: সে তার জন্য অর্থ ব্যয় করে, তার জন্য উপহারসামগ্রী ক্রয় করে এবং বিয়ে করে ও বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মোহরানার চুক্তি এরকম একটি মাধ্যম। সে তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রমাণের জন্য ও তাকে সম্মান দেয়া এবং তার মন জয় করার জন্য সে তাকে উপহার প্রদান করে যাকে 'মোহরানা' বলে।

কোরআনও মোহরানাকে এভাবে প্রকাশ করেছে, যেমন এটাকে বলা হয়েছে صَدُقَاتِهِنَّ এবং একে পরিচয় করিয়েছে 'নিহলাহ' হিসেবে, যার অর্থ হলো উপহার বা বৃত্তি। এটি মোহরানার বিধানের অন্যতম কল্যাণ এবং দর্শন।

দ্বিতীয় বিষয় : মোহরানা চুক্তি একজন নারীকে মানসিক শান্তি দেয় যাতে সে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে যে দায়িত্ব সৃষ্টিগত প্রকৃতি তার ওপর অর্পণ করেছে। যদিও যখন একজন পুরুষ ও নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তারা একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং তাদের সন্তানদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, কিন্তু এর বিপরীতে বাস্তবে দেখা যায় যে, অনেক পুরুষই তাদের দায়িত্ব পালন করে না এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বহন এবং সন্তানকে সঠিকভাবে পরিচর্যা থেকে বিরত থাকে, যেখানে প্রকৃতি সন্তান প্রতিপালনের বিশেষ দায়িত্ব নারীর ওপর অর্পণ করেছে যা উপেক্ষা করা যায় না। এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, পুরুষ হলো বপনকারী আর নারী হলো বাগান বা আবাদি জমির মতো– পুরুষ নারীর গর্ভে বীজ বপন করে এবং পরবর্তীকালে সে কার্যত নিজের ব্যাপারে মুক্ত। ধর্মীয়, আইনগত ও নৈতিকভাবে পুরুষ তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। যাহোক, যেহেতু প্রকৃতি পুরুষের ওপর তাৎক্ষণিক

কোন দায়িত্ব অর্পণ করে নি তাই সে তার স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তানকে রেখে চলে যেতে পারে এবং মুক্তভাবে উড়ে যেতে পারে। নিশ্চয়ই অধিকাংশ পুরুষ এরকম নয়, কিন্তু এরপরও তা সম্ভব এবং কখনো কখনো তা ঘটেও থাকে।

যাহোক, একজন নারী এদিক থেকে মুক্ত নয় এবং গর্ভকালীন, সন্তান প্রসবকালীন এবং ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভের সময়ের কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য। সন্তান জন্মদানের পর সে তার দুর্বল এবং নিষ্পাপ সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিতে বা তাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে না। সে তার শিশুর সেবাযত্ন ও লালন-পালন করতে বাধ্য। তার আন্তরিক মাতৃস্নেহের কারণে এবং সেসময় সন্তানের সাথে তার যে সম্পর্ক তৈরি হয় সেই কারণে সে তার শিশুকে সেবাযত্নের পর্যায়ের পরও পরিত্যাগ করতে পারে না এবং সেই সন্তানকে প্রতিপালন করা ছাড়া তার আর কোন পথ থাকে না।

এই সময়ে বাসস্থান, খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি জীবনযাপনের অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। এই পরিস্থিতিতে একজন দুর্ভাগা নারী কী করতে পারে? স্বাভাবিকভাবে একজন নারী এরূপ সম্ভাব্য ঘটনার জন্য উদ্বিগ্ন থাকতে পারে। এটিও মোহরানার ঐশী বিধানের একটি কারণ হতে পারে যে, নারীকে এমন জীবন যাপনের সময় তার জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ নিরাপত্তা প্রদান ও স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা।

যদি সাদাক স্থাবর সম্পত্তি বা নগদ অর্থ হয় তাহলে নারী তা গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় সে ব্যবহার করতে পারে আর যদি তা ধার হয় তাহলে সে তা যে কোন সময় দাবি করতে পারে। সংক্ষেপে, মোহরানাকে বিবাহের একটি নিশ্চয়তামূলক উপাদান ও প্রতিরক্ষা বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'যে কারণে সাদাক (মোহরানার দায়িত্ব) নারীর ওপর নয়; বরং পুরুষের ওপর অর্পণ করা হয়েছ–যদিও তাদের কর্ম একই রকম–তা হলো যখন পুরুষের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় তখন সে তার থেকে উঠে পড়ে এবং তার (স্ত্রীর) সন্তুষ্টি পূরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, এই কারণে সাদাক তার দায়িত্ব, নারীর নয়।'[১]

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২৬৮

ইসলামি পরিবারে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা

আবুল কাসেম

পরিবার একটি সামাজিক ক্ষুদ্র একক যার সদস্যদের ভাল-মন্দ যে কোন আচরণ ও কর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সমাজের বৃহত্তর পরিসরে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের ভিত্তি পুরুষ ও নারীর বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। এ বন্ধনের ফলে নারী ও পুরুষের ওপর অনেক দায়িত্বও আরোপিত হয়। আর এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হলেই কেবল পরিবারে সুন্দর সম্পর্ক ও প্রশান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান সুষ্ঠু সমাজের বিষয় নিশ্চিত হয়। যদি পরিবারে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে ভালবাসে ও একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান হয় তাহলে সন্তানদের বিকাশ ও শিক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি হয়। পারিবারিক দায়িত্বের গণ্ডি বেশ ব্যাপক ও তা পালন করাও বেশ কঠিন। পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে আচরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে কঠোরতা যেমন অশান্তি, অসন্তুষ্টি, গোঁয়ার্তুমি ও অন্যান্য জটিলতার জন্ম দেয় তেমনি অক্ষমতা, দুর্বলতা ও অবহেলা প্রদর্শন নৈতিক বিচ্যুতি ও পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞায় পর্যবসিত হয়। তাই ইসলামি পরিবারে নারী ও পুরুষের অবস্থান এবং তাদের আইন ও নীতিগত অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা সকলের জন্য আবশ্যক।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি ও স্বভাবগত পার্থক্য

নারী-পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ নারী ও পুরুষের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক গঠন ও যোগ্যতার ক্ষেত্রগত ভিন্নতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি ও সৃষ্টিগতভাবে নির্ধারিত। এ পার্থক্যকে অবশ্যই ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কারণ, প্রকৃতিতে প্রত্যেক সৃষ্টি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ

বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। যদি তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার না করা হয় তবে তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে। আর এটা তার প্রকৃতির ওপরও স্পষ্ট অবিচার। যেহেতু আইন এসেছে সামাজিক জীবনে প্রত্যেক সত্তার প্রয়োজন পূরণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে, সেহেতু আইনকে অবশ্যই এই প্রকৃতিগত পার্থক্যকে স্বীকার করেই অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। ইসলামি আইনে কর্তব্য ও অধিকার এ প্রকৃতিগত চাহিদা ও যোগ্যতাকে সামনে রেখেই প্রবর্তিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলছেন :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحنُ قَسَمْنَا بَيْنهم مَّعِيشَتهمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّ اوَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيرٌ مِّمَّا يجمَعُون

'তারা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করে? (বরং) আমরাই তাদের মধ্যে তাদের পার্থিব জীবনে জীবনোপায় বণ্টন করি এবং কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি যাতে একে অপরের থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং তারা যা সঞ্চয় করে তা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উত্তম।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়, যদি সকল মানুষ বুদ্ধি এবং দৈহিক ও আত্মিকভাবে একইরূপ শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হত তবে সমাজই তৈরি হত না। যেমনভাবে দেহে যদি বৈচিত্র্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকত ও সেগুলোর প্রতিটি স্বতন্ত্র ধরনের কাজ না করত তাহলে মানব দেহই গঠিত হত না। শরীরে মাংসপেশী, সুঠাম অস্থি, তরুণাস্থি, চোখ, কান, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গ স্বতন্ত্র গঠন ও সত্তার অধিকারী এবং তারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু তারা পরস্পরের পরিপূরক ও সেবক হিসেবে কাজ করে। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, রক্ত সংবহনতন্ত্র, প্রজনন ও রেচনতন্ত্র, খাদ্যনালি ও পরিপাকতন্ত্র প্রত্যেকে মানবদেহে একে অপরের থেকে সেবা গ্রহণের জাজ্বল্য উদাহরণ। মানব সমাজেও বিভিন্ন দক্ষতা, যোগ্যতা এবং শারীরিক গঠন ও আত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা পুরুষ ও নারীর মধ্যে হোক অথবা ব্যক্তিবিশেষে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য হোক, তা কখনই বৈষম্য নয়; বরং তা সমাজ নামক দেহের জন্য প্রয়োজনীয় একেক অঙ্গস্বরূপ যাদের কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য ছাড়া সুশৃঙ্খল কোন সমাজ ও কোন সামাজিক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই নারী বা পুরুষ কাউকেই অপূর্ণ

বলা অযৌক্তিক। কারণ, তাদের দৈহিক, আত্মিক ও যোগ্যতার বৈচিত্র্য ও পার্থক্য–যা তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্মগত ভিন্নতা ঘটায়–যখন পরস্পর সমন্বিত হয় তখনই পরিবার ও সমাজ পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়।

নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষিতা

মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

স্ত্রীরা তোমাদের বসন এবং তোমরা তাদের বসন।[১]

পবিত্র কোরআন এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে অভিহিত করেছে। এ উপমাটি বিবাহের আবশ্যকতা, দর্শন, জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক উপযুক্ততা যাচাইসহ অনেকগুলো দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে আমরা এ উপমার থেকে যেসব অর্থ আনুষঙ্গিকভাবে চিন্তার আয়নায় আসে তার উল্লেখ করছি: যেমন, তারা পরস্পরের বসন বা পোশাক হওয়ার অর্থ পোশাক মানানসই হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরস্পরের উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়; পোশাক যেমন ব্যক্তিকে সৌন্দর্য দান করে, স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরকে শোভামণ্ডিত করে; পোশাক যেমন মানুষের দৈহিক ত্রুটি ঢেকে রাখে, দম্পতিদেরও তাদের পরস্পরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা উচিত; পোশাক মানুষকে শীত ও গ্রীষ্মের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে, দম্পতিদের দায়িত্বও তেমনি এক অপরকে বিভিন্ন ক্ষতিকর কর্ম ও আচরণ থেকে দূরে রাখা ও পরস্পরকে রক্ষা করা; গ্রীষ্ম ও শীতের তারতম্যের কারণে যেমন পোশাক ভিন্ন ও বিপরীত বৈশিষ্ট্যের হতে হয় তেমনি স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃতি ও আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে অপরের প্রতি বিপরীত আচরণ করতে হবে, যেমন একের উত্তপ্ত আচরণের জবাবে অন্যে নরম ভাব প্রদর্শন করবে যাতে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। (এক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়কে ছাড় দেয়ার মনোভাব থাকতে হবে। তারা এটা ভাববে না যে, এতে তার আর মর্যাদা থাকবে না।) মানুষ যেমন তার পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখাকে আবশ্যক মনে

১. সূরা বাকারাহ : ১৮৭

করে, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি পরস্পরের বিষয়ে সতর্ক থাকবে যেন কলুষ ও বিচ্যুতির ময়লা তাদেরকে অপরিচ্ছন্ন না করে। পোশাক দেহের আকারের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে অর্থাৎ বড় বা ছোট হলে তা যেমন অস্বস্তি ও বিড়ম্বনার কারণ হয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপযুক্ত না হলে অশান্তি ও অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সাথে পোশাকের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। পোশাকের যত্ন নিলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, স্বামী-স্ত্রীরও দায়িত্ব হল পরস্পরের যত্ন নেয়া যাতে তাদের সম্পর্ক স্থায়ী হয়। পোশাক যেমন অব্যবহৃত থাকলে মূল্যহীন হয়ে পড়ে, স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের প্রতি অবহেলা দেখালে ও দায়িত্বহীন হলে তা সম্পর্কোচ্ছেদ ও তিক্ততায় পর্যবসিত হয় যা উভয়কে মূল্যহীন করে। মানসম্পন্ন আরামদায়ক কাপড়ের পোশাক যেমন ব্যক্তির দেহ ও মনে প্রশান্তির জন্ম দেয়, উপযুক্ত স্বামী ও স্ত্রী তেমনি পরস্পরের জন্য প্রশান্তি ও মনোতুষ্টির কারণ। নিজেকে প্রতিকূলতা থেকে রক্ষার জন্য যেমন মানুষ পোশাকের প্রতি মুখাপেক্ষী, স্বামী ও স্ত্রীও তেমনি তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন পূরণের জন্য পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী। পোশাক যত দামী হবে, তার সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য তত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, স্বামী ও স্ত্রীরও পরস্পরের মর্যাদাকে মূল্যবান গণ্য করে তা রক্ষা করে চলা অপরিহার্য।

পুরুষ– পরিবারের কর্তা

পরিবার সমাজের একটি একক হিসেবে অন্যন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত–ছোট হোক বা বড়–তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিচালক ও অভিভাবকের মুখাপেক্ষী। পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছে। মহান আল্লাহ বলছেন :

الرِّجال قَوّامون عَلى النِّساء بِما فَضَّل اللهُ بَعضَهم عَلى بَعضٍ و بِما أنفِقوا مِن أموالِهم

'পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক (ও পৃষ্ঠপোষক)। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা (পুরুষ) তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।'

আয়াতটিতে পরিবারে পুরুষের অভিভাবকত্বের সপক্ষে দুটি দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হল সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠত্ব যার কারণ হল শারীরিকভাবে পুরুষরা অধিক শক্তিশালী হওয়ায় পরিবারের সদস্যদেরকে অন্যদের আগ্রাসী তৎপরতা থেকে রক্ষায় অধিকতর সক্ষম এবং তারা বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ ও আবেগের ওপর যুক্তিকে প্রাধান্য দান করে থাকে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার আবশ্যক শর্ত। দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তা হল পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্বভার পুরুষের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে, এ অভিভাবকত্ব কখনই কর্তৃত্বপরায়ণতা ও স্বার্থপরতার ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কারণ, পরিবারকে কখনই শক্তি প্রয়োগ ও কঠোর আচরণের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তাহলে তা পরিবারকে জাহান্নামে পরিণত করবে। আর তাই এটা এমন এক নির্বাহী ক্ষমতা– যা পরামর্শভিত্তিক ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে পরিচালিত ও পরিবারের সদস্যদের মন জয় ও ভালবাসা অর্জনের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। আর নারী এক্ষেত্রে পুরুষের উপদেষ্টা ও সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

'স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যখন ও যেদিক দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর। এর মাধ্যমে তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য (উত্তম কিছু) প্রেরণ কর। আল্লাহর (শাস্তি) থেকে নিজেদের রক্ষা কর। জেনে রাখ, তোমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। মুমিনদের (এ) সুসংবাদ দাও।'[১]

এ আয়াত থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়। আর সেগুলো হল :

প্রথমত, স্ত্রীরা স্বামীর তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তায় রয়েছে। যেমনভাবে ক্ষেতের মালিক তার কৃষিভূমিকে আগলে রাখে, এটাকে অন্যের আগ্রাসনমুক্ত ও সকল প্রকার আপদ-বালাই থেকে দূরে রাখে তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

১. বাকারাহ : ২২৩

দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর কর্তব্য হল ভবিষ্যতের ফসলের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা ও এজন্য স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত থাকা। ভবিষ্যতের ফসল যেমন উত্তম সন্তান হতে পারে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দ্বীনি দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহায়তা দানের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য উত্তম সঞ্চয় প্রেরণ করাও হতে পারে।

তৃতীয়ত, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং তারা উভয়ে আল্লাহর দাস হিসেবে তাদের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্মের জন্য তাঁর নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। এজন্যই আয়াতে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে। সুতরাং স্বামীর এ বিষয়ে যথেচ্চারের কোন অধিকার নেই; বরং তাকে তার ওপর আরোপিত পারিবারিক দায়িত্বসমূহকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

নারী পরিবারে প্রশান্তিদাতা

ইসলাম প্রশান্তি অর্জনকে পরিবার গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ পরিবার গঠনের মাধ্যমে পুরুষ ও নারী প্রশান্তিতে পৌঁছায়। পবিত্র কোরআনে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের 'জোড়া' ও 'জুটি' বলা হয়েছে। এজন্য যে, তারা বিচ্ছিন্ন থাকলে সৃষ্টির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। যখন তারা যুক্ত হয় ও দৈহিক ও আত্মিকভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে তখনই কেবল ঐ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়। মহান আল্লাহ দুটি আয়াতে[১] নারী ও পুরুষ সৃষ্টির দর্শন 'পরস্পরের নিকট প্রশান্তি অর্জন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যও হল এ প্রশান্তি অর্জন। তাই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব হলো শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কিন্তু নারী তার প্রকৃতিগত কোমল স্বভাব ও স্নেহ-মমতার কারণে এক্ষেত্রে মূল পরিচালকের ভূমিকায় রয়েছে। তাকে কেন্দ্র করেই পরিবারে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয় ও বজায় থাকে।

পরিবারে অন্তরঙ্গ ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা

পবিত্র কোরআনের আয়াত, মহানবি (সা.) ও নিষ্পাপ ইমামদের (আ.) থেকে বর্ণিত হাদিস এবং তাঁদের জীবনী থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বিয়ে নারী-পুরুষের

১. সূরা আ'রাফ : ১৮৯ ও সূরা রূম : ২১

মধ্যে ভালবাসা ও মমতা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই পরিবার সম্প্রীতি, প্রশান্তি এবং স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের সর্বোত্তম স্থান। এখানেই এর সদস্যরা অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা ও উপেক্ষা করা, নিঃস্বার্থ হওয়া, পরস্পরের জন্য ত্যাগ, অন্যের অধিকারকে সম্মান দেখানো ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে। আর যদি কোন পরিবারে অন্তরঙ্গ ও স্নেহ-মমতায় পূর্ণ পরিবেশ না থাকে তাহলে কখনই তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ ভালবাসা ও মমতাই পরিবারে ইসলামি প্রশিক্ষণের ভিত্তি। এ কারণেই ইসলাম পরিবারে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরোধী। বিশ্ববাসীর আদর্শ মহানবি (সা.)-এর জীবনী ও কর্ম এ সত্যকে প্রমাণ করে। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে পরিবারের (স্ত্রী ও সন্তানদের) জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিজের পরিবারের জন্য উত্তম।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল যে তার স্ত্রীর জন্য উত্তম, আর আমি আমার স্ত্রীদের জন্য সবচেয়ে উত্তম।'[১]

তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে তার স্ত্রীকে দাসের মত প্রহার করে সে কি লজ্জা করে না? তোমাদের উত্তমরা কখনই তা করবে না।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি থেকে আশ্চর্য বোধ করি যে তার স্ত্রীকে প্রহার করে, অথচ সে নিজেই প্রহৃত হওয়ার অধিক উপযুক্ত। তোমাদের স্ত্রীদের কখনই বেত দিয়ে প্রহার কর না। কারণ, এতে কিসাস (প্রতিশোধমূলক অনুরূপ শাস্তির বিধান) রয়েছে। বরং তারা গুরুতর কোন অপরাধ করলে ক্ষুধা ও বঞ্চনার দ্বারা শাস্তি দাও। তবেই তোমরা পৃথিবী ও পরকালে স্বস্তিতে থাকবে।' তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার তাকিদপূর্ণ নির্দেশকে স্মরণ রাখ যাতে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পার। আর কেউ যদি এ নির্দেশ পালন না করে তবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার দিন তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে।'[২] মহানবী (সা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে : ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করে। ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করে।'[৩]

১. ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১৪ম খণ্ড, পৃ. ১১৯
২. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২৪৯, হাদিস ৩৮
৩. মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকিহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩, হাদিস ৪১৭

নারী সাহাবী হযরত হাওলা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'জীবরাঈল (আ.) স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার কাছে এতটা তাকিদপূর্ণ নির্দেশ এনেছেন যে, আমার মনে হয়েছে তার প্রতি অসন্তোষমূলক কিছুই বলা যাবে না।'[১]

ইসলামের পারিবারিক নীতিমালা

ইসলাম এর অনুসারীদের এমন কিছু নীতিমালা শিক্ষা দেয় যা মেনে চললে পরিবারের সদস্যরা অনেক ধরনের বিপদ ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা ভালভাবে রক্ষিত হয়। যেমন : বেগানা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমা রক্ষা।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক অবশ্যই শরীয়তের নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। একারণেই ইসলাম পর্দা ও হিজাবের বিষয়টি আবশ্যক করেছে। পরিবারের মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি সৃষ্টিতে পর্দার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে :

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের চাদরগুলোর অবগুণ্ঠন ঝুলিয়ে[২] রাখে; নিশ্চয়ই এটা তাদের (শালীন ও সম্ভ্রান্ত নারী হিসেবে) পরিচিতির নিকটতর; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।'[৩]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন : '(হে রাসূল!) বিশ্বাসী নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে এবং তাদের শোভা প্রকাশ না করে; তবে যা আপনা হতেই প্রকাশিত তা স্বতন্ত্র; এবং তাদের ওড়না দিয়ে যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখে এবং তাদের শোভা যেন...(মাহরাম ব্যতীত)

১. ওয়াসায়িলুশ শিয়া, ১৪ম খণ্ড, পৃ. ২৫২, হাদিস নং ১৬৬২৬
২. কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, 'জালবাব' হল চাদর যা মাথা হতে পা অবধি আবৃত করে রাখে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এটা বড় ওড়না যা মাথায় থাকে।
৩. সূরা আহযাব : ৫৯

কারও নিকট প্রকাশ না করে; এবং চলার সময় ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করে যাতে তাদের যে শোভা তারা গোপন করে তা প্রকাশ পেয়ে যায়।'[১]

ইসলামি শরীয়তে নারীর জন্য তার মুখমণ্ডল এবং আঙ্গুল থেকে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ব্যতীত সমগ্র শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যক। আর এ নির্দেশ পুরুষ ও নারীর আত্মিক ও মানসিক সুস্থতা ও শান্তিকে নিশ্চিত করার জন্যই দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম বেগানা নারী ও পুরুষের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় ও কথোপকথনের ক্ষেত্রেও কিছু নীতিমালা মেনে চলতে বলেছে। যেমন রাসূল (সা.)-এর হাদিসে না মাহরাম অর্থাৎ বেগানা নারী ও পুরুষের দিকে দৃষ্টিদানকে শয়তানের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীর বলা হয়েছে।[২] এবং নারীদের পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় (ভঙ্গী ও) কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

তেমনি ইসলামে নারী ও পুরুষের জন্য যেখানে অন্য মানুষের আনাগোনা নেই এমন স্থানে একান্ত ও নিভৃত আলোচনা থেকে বারণ করা হয়েছে।

বিবাহিত জীবনের প্রতি নিবেদিত থাকা

বৈবাহিক জীবনে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এ অর্থে যে, পরিবারের বাইরে অবৈধ কোন শারীরিক সম্পর্ক রাখবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...﴿٣١﴾

'(হে রাসূল!) বিশ্বাসীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চক্ষুগুলোকে (হারাম দৃষ্টি থেকে) নত রাখে, তাদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষিত রাখে; এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। আর বিশ্বাসী

১. সূরা নূর : ৩১
২. বিহারুল আনওয়ার, ১০৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৯
৩. সূরা আহযাব : ৩২

নারীদেরকেও বলে দিন, তারা যেন তাদের চক্ষুগুলোকে (নিষিদ্ধ দৃষ্টি থেকে) নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে... ।'[১]

সুতরাং পরিবারের বাইরে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকা কেবল নৈতিক দায়িত্ব বলেই বিবেচিত নয়; বরং ধর্মীয় আইনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ বিষয়টি লঙ্ঘিত হলে তাদের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় যা পারিবারিক অশান্তির জন্ম দেয় ও সন্তানদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ইসলামি দণ্ডবিধিতে ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য কঠোর বিধি রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার জন্য অপর যে নীতিটি পালন করা অপরিহার্য তা হল বিয়ের পূর্বে ও পরে প্রকাশ্য ও গোপন প্রণয় থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে (স্বাধীন ও) সচ্চরিত্রা নারী এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে সচ্চরিত্রা নারীরা তোমাদের জন্য বৈধ, যখন তোমরা তাদের দেনমোহর দাও পবিত্রতা রক্ষার (বিবাহের) উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়; আর গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবেও নয়।'[২] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যাদের বিশ্বাসী-স্বাধীন নারীদের বিয়ে করার মত অর্থনৈতিক সঙ্গতি নেই, তারা তোমাদের অধীনা বিশ্বাসী ক্রীতদাসীদের বিয়ে করবে... তবে যেন তারা সতীত্ব রক্ষাকারিণী হয়, ব্যভিচারিণী না হয় এবং তাদের গোপনে প্রণয়িনী হিসেবে গ্রহণ না করে... যারা প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা ব্যাপকভাবে (গর্হিত কাজের দিকে) ঝুঁকে পড়।'[৩]

এ দু'টি আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ইসলাম বিবাহ-বহির্ভূত যে কোন প্রণয়ের সম্পর্ককে অবৈধ বলে গণ্য করে। কেননা, তা নারী-পুরুষকে অবৈধ সম্পর্ক ও যৌন অনাচারের দিকে প্ররোচিত করে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা

পারিবারিক অশান্তির অন্যতম বড় কারণ হল স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানা এবং পালন না করা। এজন্য

১. সূরা নূর : ৩০-৩১
২. সূরা মায়িদাহ : ৫
৩. সূরা নিসা : ২৫ ও ২৭

পারিবারিক জীবনের শুরুতেই পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। এ অবগতি তাদের পরস্পরের কাছে অযাচিত দাবি ও চাওয়াকে নিঃসন্দেহে সীমিত করবে। এ বিষয়ে পাঠকমণ্ডলীকে অবহিত করার জন্য এ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল। মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের পরস্পরের ওপর অধিকার সম্পর্কে বলেন :

(শরীয়ত অনুযায়ী) তাদের (নারী) জন্য (পুরুষের ওপর) ন্যায়সঙ্গত কিছু অধিকার আছে যেমন তাদের ওপর পুরুষের আছে। তবে নারীর ওপর পুরুষের (অধিকারগত) কিছুটা প্রাধান্য রয়েছে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

ইসলামের অন্যতম অনন্য বৈশিষ্ট্য হল সকল উন্নত মানবীয় গুণ, নৈতিক কর্ম ও আচরণকে আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য করেছে। এ কারণেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করলেও তা ইবাদতের শামিল। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে নারী সাতদিন তার স্বামীর সেবা করবে আল্লাহ তার জন্য আটটি বেহেশতের দ্বারই উন্মোচিত করবেন এবং জাহান্নামের সাতটি দ্বারই তার জন্য বন্ধ করা হবে।' তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'কোন নারী যদি তার স্বামীকে এক চুমুক পানি খাওয়ায় তা তার এক বছরে রাত জেগে ইবাদত করা থেকে উত্তম।' এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে স্বামী ও স্ত্রীর কয়েকটি অধিকারের উল্লেখ করছি।

স্বামীর অধিকারসমূহ

১. স্বামীর দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ : স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের এ চাহিদা পূরণের প্রয়োজন রয়েছে। হাদিসে তাদের এ পারস্পরিক চাহিদা পূরণকে আল্লাহর পথে সংগ্রামের সমতুল্য জ্ঞান করে তার সমান পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। স্বামীর যৌন চাহিদা পূরণের জন্য নারীকে তার সৌন্দর্য ও আকর্ষণের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটানো বাঞ্ছনীয় যাতে স্বামী এ ক্ষেত্রে কখনও শূন্যতা অনুভব করে অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়। এজন্য নারী যতটা সম্ভব গৃহে নিজেকে পরিপাটি ও সজ্জিত রাখবে এবং স্বামীর মানসিক প্রশান্তির ক্ষেত্র তৈরি করবে। নারীর জন্য পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান, সাজগোজ করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা অত্যন্ত

১. সূরা বাকারাহ : ২২৮

পছন্দনীয় কাজ। তাই এ বিষয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর সামনে অনুগত থাকতে ও গৃহে এ অনুভূতির উষ্ণতা জাগ্রত রাখতে হবে। এতে ঘাটতি হলে পরিবারে সমস্যার সৃষ্টি হবে। ইসলামে বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ শুধু দৈহিক দৃষ্টিতেই কাম্য নয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও তা অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে। কারণ, এটি মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যক্তিকে খোদামুখি করতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিকে নিজেকে ভালবাসার গণ্ডি অতিক্রম করে সঠিকভাবে অন্যের জন্য ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী যে, যারা আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে বিয়ে থেকে বিরত থাকে তাদের মধ্যে একরূপ অপূর্ণতা বিদ্যমান। তারা সামাজিক অনেক সম্পর্ক ও বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারে না।

২. **পারিবারিক বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা :** স্ত্রীকে শরীয়তের সীমায় ও যৌক্তিক ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য কররতে হবে। স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ও তার অসন্তুষ্টির কাজে অর্থ ব্যয় করা, তার অনুমতি ব্যতীত কোন মুস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করা (যেক্ষেত্রে তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়) এবং তার প্রতি অসদাচরণ করা অন্যায়।

৩. **স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরে না যাওয়া :** স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া গৃহ থেকে বের হওয়া গুনাহর কাজ। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'কোন নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলে সে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতা তার ওপর অভিশম্পাত করে।'

স্ত্রীর ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির আবশ্যকতার বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় হল, যদিও স্বামীর এ অধিকার রয়েছে যে, তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য তাকে বাড়ির বাইরে অধিক ও অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু তার এ অধিকার নেই যে, স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জ্ঞান এবং আবশ্যক ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিধান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে। কারণ, অনেক জ্ঞান রয়েছে যা শিক্ষা করা সব নারীর জন্য অথবা একদল নারীর জন্য ফরয যা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার স্বামীর নেই। এজন্য স্বামীকে হয় তার ঘরেই এরূপ শিক্ষার ক্ষেত্র ও উপকরণ প্রস্তুত করতে হবে অথবা স্ত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে। ইসলামি সমাজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক শাখায় শিক্ষা নারীর জন্য আবশ্যক বলে গণ্য হয়। যেমন- প্রসূতিবিদ্যা, নারীরোগ, রোগনির্ণয়ের

পরীক্ষাগার, সেবিকাসহ নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে যদি নারীদের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান না থাকে তবে এক্ষেত্রে শরীয়তের অনেক বিধান (যেমন বেগানা পুরুষের সংশ্রবে যাওয়া ও শরণাপন্ন হওয়া, পর্দা ও শালীনতার বিধান) লঙ্ঘিত হবে। এছাড়াও এরূপ অনেক বিষয় আছে যা জানা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য অপরিহার্য। এসকল ক্ষেত্রে অবশ্যই নারীকে বাধ্য হয়ে ঘরের বাইরে যেতে হবে এবং পিতা, ভাই ও স্বামীর বাধা প্রদানের অধিকার নেই।

স্ত্রীর অধিকারসমূহ

এর বিপরীতে পুরুষকেও তার স্ত্রীর অধিকারগুলো দিতে হবে। ইসলামে স্ত্রীর অধিকার প্রদানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, 'জীবররাঈল (আ.) স্ত্রীর ব্যাপারে এত অধিক তাগিদ দিয়েছে যে, আমি ভাবলাম তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ ব্যতিরেকে তালাক দেয়া বৈধ নয়।'[১]

স্ত্রীদের অধিকারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা : স্ত্রীর পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও সংসারের জন্য আবশ্যক আসবাবপত্রের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব সকল অবস্থায় পুরুষের ওপর ন্যস্ত। এক্ষেত্রে পুরুষকে অবশ্যই তার স্ত্রীর পরিবারের সামাজিক মর্যাদাকে বিবেচনায় রাখতে হবে ও স্ত্রী নিজে বিত্তশালী হলেও তার খরচের ভার বহনের দায়িত্ব পুরুষের। অথচ পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কেবল তারা দরিদ্র (জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহে অপারগ) হলেই তাদের খরচ বহনের দায়িত্ব সন্তানের ওপর বর্তায় অর্থাৎ ওয়াজিব হয়। ফকীহরা স্ত্রীর পারিবারিক মর্যাদা সাপেক্ষে স্বামীর ওপর নিম্নোক্ত বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করা অপরিহার্য বলেছেন। যথা : খাদ্য, পোশাক, বিছানা, মাদুর বা কার্পেট, নিতান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকরণ, থাকার স্থান ও গৃহপরিচারিকা। খাদ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্ত্রীর জন্য তা পর্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তবে দামী হওয়া জরুরি নয়। (তবে এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর জন্য খাদ্য

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫১

প্রস্তুত করে পরিবেশন করতে বাধ্য নয়; বরং স্বামীর জন্য যা আবশ্যক তা হল তার স্ত্রীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদানুযায়ী ঐরূপ নারীর জন্য খাদ্য প্রস্তুতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা তাকে দেবে।)

ভরণপোষণ দেয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন ফকীহ পুরুষের সামর্থ্যকে মানদণ্ড বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআন বলছে : এক্ষেত্রে ধনশালী তার অবস্থা অনুযায়ী এবং স্বল্পজীবিকার অধিকারী আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন সে (অর্থাৎ তার সাধ্য) অনুযায়ী ভরণপোষণ দেবে। (কারণ,) আল্লাহ কেবল মানষের ওপর তাকে যা দিয়েছেন তদনুযায়ী দায়িত্ব আরোপ করেছেন। (সূরা তালাক : ৭) তাই সচ্ছল ব্যক্তির জন্য স্ত্রীর ওপর খরচের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আরোপের সুযোগ নেই। তবে কখনই তা যেন অপচয়ের পর্যায়ে না পৌঁছায়। পোশাকের ক্ষেত্রেও স্ত্রীর সমমর্যাদার নারীর জন্য উপযোগী পোশাক দিতে হবে। আর সম্ভব না হলে শীত-গ্রীষ্ম ও মৌসুমের জন্য সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মানের পোশাক দেয়া বাঞ্ছনীয়।

পুরুষের জন্য পরিবারের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে অবহেলা ও কৃপণতা করা অপছন্দনীয় কাজ। পরিবারের সচ্ছলতার জন্য প্রচেষ্টাকারী পুরুষকে হাদিসে আল্লাহর পথে জিহাদ ও সংগ্রামকারী করে অভিহিত করা হয়েছে। তবে বিলাসিতার জন্য স্ত্রী যেন স্বামীর ওপর সাধ্যাতীত বোঝা না চাপায় এবং অনাবশ্যক অর্থ খরচে বাধ্য না করে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ঐ নারী সৌভাগ্যবান যে তার স্বামীকে সম্মান করে ও তার অনুগত থাকে। আর যে নারী তার স্বামীকে কষ্ট দেয় সে অভিশপ্ত।' এ কষ্টদানের ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন- স্বামীর সাধ্যের অতীত বস্তু তার নিকট চাওয়া, নিতান্ত প্রয়োজন নয়– এমন কিছু কিনতে কিংবা বিশেষ ধরনের গৃহ ও পোশাকের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা, নিজেকে বড়লোক জাহির ও অহঙ্কার করার উদ্দেশ্যে জিনিস ক্রয়ে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া, স্বামীর অনুমতি ছাড়া যখন তখন বাইরে যাওয়া ইত্যাদি।

২. **শারীরিক চাহিদা পূরণ :** স্ত্রীর দ্বিতীয় অধিকার হল স্বামী চার মাসের বেশি তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক পরিত্যাগ না করে। তবে যদি স্ত্রী এতে সম্মত থাকে অথবা স্বামী চাকুরিগত জরুরি কাজ বা হজের মত ফরজ কোন দায়িত্ব পালনে সফরে থাকে তবে ভিন্ন কথা। হাদিসে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া স্ত্রীর সাথে চার মাসের অধিক শারীরিক সম্পর্ক ত্যাগ করা গুনাহ বলে পরিগণিত হয়েছে। কোন কোন হাদিসে প্রতি

চারদিনে একবার স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া আবশ্যক বলা হয়েছে (যদিও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত না হয়)।

৩. **উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত না করা :** স্ত্রী ও সন্তানদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ানোর পর জানতে পারেন সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের বঞ্চিত করে তার সব সম্পদ ইসলামের পথে খরচের জন্য অসিয়ত করে গিয়েছে এবং এর ফলে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'যদি আমি জানতাম সে এমন করেছে তবে তার জানাযার নামায পড়তাম না।'

৪. **স্ত্রীর সম্মান যথাযথভাবে বজায় রাখা :** স্ত্রীর সম্মান রক্ষা ও মানুষের সামনে তাকে ছোট না করা এবং তার প্রতি অসদাচরণ না করা স্ত্রীর অন্যতম অধিকার। কখনও কখনও দেখা যায়, পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপমানকর কথা বলে ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে– যা স্ত্রীর মনোবেদনার কারণ হয়। এতে সে স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে ও পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হল সে যার স্ত্রী তার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে অন্যের আশ্রয় নেয়।'

পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্বসমূহ

কিন্তু এ দিকটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, পরিবার প্রতিষ্ঠানটিকে এর সদস্যদের কার কতটুকু আইনগত অধিকার রয়েছে তার ভিত্তিতে পরিচালনা করা সম্ভব নয়; বরং পরিবার নৈতিক দায়িত্বনির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান যাতে স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকে স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে গৃহ ও বাইরের কাজ তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও সত্তাগত প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ভাগ করে নেবে। তবেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার সৃষ্টি হবে। যেমন পুরুষরা কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজগুলো এবং নারীরা পরিবার দেখাশোনা ও সন্তান পরিচর্যার গুরুদায়িত্বটি পালন করবে।

মহানবী (সা.) এরূপ নির্দেশনাই তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) ও জামাতা আলী (আ.)-এর ক্ষেত্রে দিয়েছেন। ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের বিবাহিত জীবনের শুরুতেই আল্লাহর রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের কাজের বিভাজনের বিষয়ে নির্দেশনা চাইলে তিনি হযরত ফাতিমার জন্য গৃহের

অভ্যন্তরের কর্ম নির্ধারণ করেন এবং হযরত আলীর ওপর বাইরের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এর ভিত্তিতে হযরত আলী জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পানি আনা ও বাইরের অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করতেন এবং হযরত ফাতিমা যাঁতায় আটা পিষা, খামির তৈরি, রুটি বানানো ইত্যাদি কাজ করতেন।

সুতরাং মনে রাখা আবশ্যক যে, যদিও সন্তানদের দেখাশোনা করা, রান্না, কাপড় ধোয়া ও গৃহস্থালি অন্যান্য কাজ করা নারীর আবশ্যক কোন দায়িত্ব নয়, কিন্তু গৃহ ও বাইরের কাজের দায়িত্ব নারী ও পুরুষের মধ্যে পৃথক করা হলে পুরুষ তার ওপর আরোপিত দায়িত্বটি যথাযথ পালন করতে পারে এবং নারীও পরিবারে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে, নারী কোন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে না।

মোটকথা হল নারীর জন্য পারিবারিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি কখনই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। ইসলামি বিপ্লবের মহান নেতা আলী খামেনেয়ী এ বিষয়ে বলেন: 'মাতৃত্ব, সন্তান পালন, পরিবারের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন নারী কোন বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞও হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় অথবা পরিবারে এ ভূমিকাগুলো পালন না করে, তবে নিঃসন্দেহে ঐ নারীর জন্য তা অপূর্ণতা বলে বিবেচিত। তবে মনে রাখতে হবে যে, নারীর গৃহকর্ম যেন তাকে এতটা বেশি ব্যস্ত না রাখে যা তার প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ, ধর্মীয় অধ্যয়ন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রের সার্বিক বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও যেন তাকে এতটা ব্যস্ত না রাখে যা তার সন্তান পালন ও প্রশিক্ষণের মহান দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখে অথবা তা বাধাগ্রস্ত করে।'

তিনি অন্যত্র বলেন : 'আমার দৃষ্টিতে পরিবার ও পরিবার সংক্রান্ত সকল বিষয় মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। পরিবারে ও ঘরে নারীর নিরাপত্তা এবং যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকতে হবে। নিঃসন্দেহে পরিবারে নারীর সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল তার জন্য প্রশান্তি ও উপযুক্ত সন্তান প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। আর পরিবারের প্রধান হিসেবে এ কাজটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পুরুষের।'

তিনি পরিবারে স্ত্রীর অতুলনীয় ভূমিকার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন : 'মহান ব্যক্তিদের জন্যও স্ত্রীর এমন ভূমিকা থাকে যা সন্তানদের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকার সাথে তুলনীয়। নারীত্বের বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ নারীরা এক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্মতা ও দক্ষতার অধিকারী। তারা জানে, পুরুষদের প্রকৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিপক্ব ও ক্ষুদ্র আঘাতের সামনেও ভঙ্গুর, কেবল স্ত্রীর ভালবাসা ও সান্ত্বনাই তাকে পরিপুষ্ট ও প্রতিরোধক্ষম করতে পারে– অন্য কিছু নয়। এমনকি মাতাও এরূপ ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়।'

স্বামীর নৈতিক দায়িত্বসমূহ

১. সুন্দর ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রক্ষা করা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকা খুবই আবশ্যক। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উষ্ণতা ও ভালবাসা ছড়িয়ে দেয় যার ফলে তাদের মনে সজীবতা, প্রশান্তি, প্রফুল্লতা ও নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিবার মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলছেন : 'এবং তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচার কর। আর যদি তুমি কোন কারণে তাকে অপছন্দও কর, তবুও (দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না। কারণ,) হয়ত কোন জিনিস তুমি অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ তোমার জন্য তাতে অত্যধিক কল্যাণ রেখেছেন।'[১] কোরআনে এমনকি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথেও সদ্ব্যবহারের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, জোরপূর্বক তাদের থেকে দেনমোহর ফিরিয়ে নিতে এবং বিচ্ছেদের পরও তিনমাস তাকে স্বীয় গৃহ থেকে বহিষ্কার করতে নিষেধ করা হযেছে।[২]

২. রাতে ঘরের বাইরে অবস্থান না করা : ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন, 'পুরুষের জন্য (স্বীয় শহরে অবস্থানকালে) নিজের গৃহের বাইরে রাত কাটানো ধ্বংসকর।'[৩]

৩. স্ত্রীকে গৃহকর্মে সাহায্য করা : এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বলেন : 'হে আলী! সত্যবাদী নবী, আল্লাহর পথে শহীদ ও যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও

১. সূরা নিসা : ১৯
২. সূরা বাকারাহ : ২২৮-২৩১ ও সূরা তালাক : ৬
৩. মান লা ইয়াহদ্বুরুহুল ফাকিহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

আখেরাতের কল্যাণ চান সে ব্যতীত কোন পুরুষ পরিবারে স্ত্রীকে তার কাজে সাহায্য করে না। আর এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দেহের লোম ও মাথার চুলের সমসংখ্যক সওয়াব দেবেন, তার জন্য এক বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব লেখা হবে এবং হযরত ইয়াকুব, হযরত ঈসা ও হযরত দাউদের দ্বীন প্রচারের ন্যায় পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।'

৪. স্ত্রীর ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেয়া : আলী (আ.) বলেছেন : 'স্ত্রীর ওপর তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিয়ে দিও না। কারণ, নারী হল ফুল, সে পরাক্রমশালী (চাপ সহ্য করার উপযোগী) নয়।'

৫. স্ত্রীকে ভালবাসা : যদি স্ত্রী তার স্বামীর প্রেম ও ভালবাসায় সবসময় সিক্ত থাকে তবে সে তার সন্তানদেরকেও নিজের স্নেহ-মমতায় আপ্লুত করবে। এ বিষয়টিকে শহীদ অধ্যাপক মোর্তাজা মোতাহহারী এভাবে উপমা দিয়েছেন : 'পুরুষ হল বৃষ্টিধারী এক পর্বত যাতে নারী প্রস্রবণের মত আর সন্তানরা বৃক্ষলতা ও ফুলস্বরূপ। প্রস্রবণ কেবল তখনই পারে সবুজ গাছ-গাছালি ও সুন্দর ফুলের জন্ম দিতে যখন পর্বতের ভেতরে সঞ্চিত পরিশুদ্ধ পানি তার মধ্যে প্রবাহিত হয়। যে পর্বতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় না বা তা আদৌ পানি ধারণ করে না তা থেকে প্রস্রবণ বের হয় না এবং তাতে বৃক্ষ ও ফুলের জন্ম হয় না। পর্বত ও তার পাদদেশের সবুজ-শ্যামলতা যেমন বৃষ্টি ও পর্বতের বৃষ্টিধারণের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল, পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তেমনি নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা ও নির্মল আবেগ-অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল।' তাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যবসায়িক যৌথ বা অংশীদারী কারবারের মত নয় যে, পরস্পরের লাভক্ষতির হিসাব করে তা টিকিয়ে রাখবে বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কখনও কখনও এমন হতে পারে যে, কোন নারীর সৌন্দর্য তার স্বামীকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু ঐ নারী ধর্মীয় ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ এবং পারিবারিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে ও সন্তানদের মাতা হিসেবে উত্তম। এরূপ অবস্থায় পুরুষের উচিত স্ত্রীর এরূপ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে পছন্দ করা ও মেনে নেয়া। এ দিকটির প্রতি ইশারা করে মহান আল্লাহ বলেছেন : 'আর যদি তোমরা কোন কারণে তাদের (স্ত্রীদের) অপছন্দও কর, (তদুপরি দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না। কারণ,) হয়ত কোন জিনিস তুমি অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ তোমার জন্য তাতে অত্যধিক কল্যাণ রেখেছেন।'[১]

১. সূরা নিসা : ১৯

স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্বসমূহ

১. সংসার দেখাশোনা ও স্বামীর সেবা-যত্ন করা : যদিও ইসলামে পুরুষ ও নারী কারো ওপরই গৃহের কর্মসম্পাদন আবশ্যক করা হয় নি অর্থাৎ স্ত্রী যেমন গৃহে রান্নাবান্না করতে ও স্বামী-সন্তানের কাপড় ও পোশাক ধুতে বাধ্য নয়, তেমনি স্বামীও স্ত্রীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পরিবেশন করতে বাধ্য নয়। কিন্তু নারীর জন্য গৃহকর্ম সম্পাদন ইসলামে মর্যাদার কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম বাকির (আ.) বলেন : 'নারীর জিহাদ হল উত্তমরূপে স্বামীর সংসার দেখা।' উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাহ আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে নারীর জন্য স্বামীর সেবায় কী মর্যাদা রয়েছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : 'যখন কোন নারী তার স্বামীর গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বা গোছানোর জন্য কোন বস্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরায়, আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। আর আল্লাহ যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন তাকে কখনও শাস্তি দেন না।' তিনি এ সম্পর্কে আরো অধিক জানতে চাইলে তিনি বলেন : "হে উম্মে সালামাহ! যখন কোন নারী সন্তান ধারণ করে, তখন তার পুরস্কার মহামহিম ও পরাক্রমশালী আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে যুদ্ধকারী ব্যক্তির সমান। আর যখন কোন নারী সন্তান জন্ম দান করে তখন তাকে (ঐশীভাবে সম্বোধন করে) বলা হয় : 'তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। সুতরাং নতুনভাবে জীবন শুরু কর।' আর যতবার সে তার সন্তানকে স্তন্যপান করায় ততবার তাকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের থেকে কোন ব্যক্তি দাস হলে তাকে মুক্ত করার সমান সওয়াব দেয়া হয়।"

নারীদের স্বভাবগত কোমলতা ও ধৈর্যশীল চরিত্রের কারণে পরিবারে সম্প্রীতিপুর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই ইমাম আলী (আ.) উত্তম নারীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাদের মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা: উচ্চ দেনমোহর কামনা করে না, বিনয়ী, স্বামীর অনুগত, কোন কারণে স্বামী রাগান্বিত হলে তার রাগ প্রশমিত না করা পর্যন্ত ঘুমায় না এবং তার স্বামীর অনুপস্থিতেও তার সম্পদ ও সম্মান রক্ষায় ব্রতী থাকে। এমন নারী (পৃথিবীর ওপর)

আল্লাহর নিয়োজিত দায়িত্বশীল এক কর্তা যার কর্মকে তিনি কখনও বিনষ্ট ও প্রতিদানহীন হতে দেবেন না।[১]

উপরিউক্ত নৈতিক দায়িত্বগুলো পালন ছাড়াও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, পরস্পরের প্রতি সুধারণা, অল্পে সন্তুষ্টি, পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়।

সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, পরিবারের অভিভাবক হিসেবে পিতা-মাতা ও অন্য পৌঢ় সদস্যদের ওপর সন্তান ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। একারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন : 'জেনে রাখ, তোমরা সকলেই পরিচালক এবং তোমাদের অধীনস্তদের ওপর দায়িত্বশীল হিসেবে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক জনসাধারণের ওপর দায়িত্বশীল হিসেবে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের সদস্যদের পরিচালক হিসেবে তাদের ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, নারী তার স্বামীর সংসার ও সন্তানদের দায়িত্বশীল হিসেবে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা সকলেই তোমাদের অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[২] মহান আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন : হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে সেই (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[৩] মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন, তাঁর বিরোধিতা থেকে দূরে থাকা এবং প্রবৃত্তির মন্দ কামনা-বাসনা পরিহার করার মাধ্যমেই কেবল নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। আর পরিবারের সদস্যদের আগুন থেকে মুক্ত রাখতে হলে তাদের সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের জন্য সুস্থ ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা তাদের চিন্তা ও কর্মকে কলুষমুক্ত রাখার পদক্ষেপ নিতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে পরিবার ও সন্তানদের কীভাবে আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে এ

১. উসূলে কাফি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫
২. জামেয়ে আহাদিসে শিয়া, ২০তম খণ্ড, পৃ.২৫৫
৩. সূরা তাহরীম : ৬

সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলেন : 'তাদেরকে যা কিছু আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করার আদেশ দাও ও যা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা করতে নিষেধ কর। যদি তারা না শোনে, তাহলে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ।'

যদি পিতা-মাতারা ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সন্তানদের প্রশিক্ষিত করে ও আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে তাদেরকে সমাজে উপহার দেয় তা শুধু তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেই প্রভাব রাখে না বরং তাদের পরলৌকিক জীবনের সৌভাগ্যকেও নিশ্চিত করে। শৈশবকালে শিশুরা সম্পুর্ণরূপে পিতা-মাতার ওপর আস্থাশীল থাকার কারণে তাদেরকেই সবকিছু জন্য আদর্শ মনে করে। তারা পিতা-মাতার প্রতিটি ও কথা ও আচরণকে সূক্ষ্মভাবে দেখে ও হুবহু তার অনুকরণ করে। যদি পিতা-মাতার মধ্যে সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা,আদর-স্নেহ, অপরকে ভালবাসা, সকলের প্রতি সুধারণা ও সদ্ব্যবহার, শুভ ও মঙ্গল কামনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তাহলে সন্তানরা অবচেতনভাবে তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যদি তারা দেখে পিতা-মাতা ধর্মীয় বিধিবিধান ও আচার মেনে চলে, সবসময় আল্লাহর স্মরণ, দোয়া ও মোনাজাতে রত থাকে, আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে তবে শিশুরাও তা শিখে ও তাদের অনুরূপ হওয়ার চেষ্টা করে।

যেহেতু শিশুর সঙ্গে তার চারপাশের জগতের আত্মিক সম্পর্ক পরিবারের গণ্ডিতেই গড়ে ওঠে সেহেতু পরিবার হল শিশুর সামাজিক ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরিবারে সে ধৈর্যধারণ, ব্যথা-বেদনা মোচন ও ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি শিক্ষাগ্রহণ করে। যদি এসকল বিষয়ে সে পরিবার থেকে সহযোগিতা পায় এবং পরিবারে তার চাওয়া-পাওয়া ও ভালবাসার চাহিদা পূরণ হয় তবে সে পরিবারের বাইরে প্রশান্তি খুঁজবে না। তখন আর বাইরের পরিবেশে তাকে প্রতারিত করার যে শত রকমের ফাঁদ পাতা রয়েছে তাতে পা দেবে না। কিন্তু যদি পরিবারে শিশু ও কিশোরকে অবহেলা করা হয় অথবা অযৌক্তিকভাবে তার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ করা হয় অথবা তার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভাল কাজে উৎসাহিত করার পরোক্ষ কৌশল অবলম্বন না করে শুধু আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে তার ওপর জোরপূর্বক কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া হয় তবে শিশু সঠিকভাবে বিকশিত হবে না। শিশু যদি পিতা-মাতার মধ্যে মিথ্যাবাদিতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা, রূঢ়, কঠোর ও অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং অনৈতিক ও

অশালীন বিষয় প্রত্যক্ষ করে, তবে তাকে উপদেশ দিয়ে উত্তম আচরণ শেখানো যাবে না। কারণ, তাদের কথা ও কর্মের মধ্যে অমিল তার কাছে ভালকর্মকে মূল্যহীন করে তুলবে। তাই শিশুকে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতাকেই প্রথমে উত্তম স্বভাব ও আচরণের অধিকারী হতে হবে।

উপসংহার

পারিবারিক সৌভাগ্য স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। যদি তারা পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করে এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর অটল থাকে তবেই পরিবারে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এরূপ পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল এর সদস্যরা ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ, তারা পরস্পরের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল, সকলে সকলের দৈহিক, আত্মিক ও মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় রত, পরস্পরের ইতিবাচক গুণগুলোর বিকাশ ঘটাতে সহায়তা দান করে, নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগে সাহায্য করে, তাদের মধ্যে ক্ষমা ও উদারতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

বিশেষ নিবন্ধ

হযরত ফাতিমা (আ.)-এর জীবন যাপন পদ্ধতি ও নেদারল্যান্ডের নারী

হযরত ফাতিমা (আ.)-এর জীবন যাপন পদ্ধতি এবং নেদারল্যান্ডের নারী

সারা পাস্তুর

প্রশ্ন হচ্ছে, আমার দেশের নারীরা কিভাবে হযরত ফাতিমার জীবন যাপনের পদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে?

আমার দেশ নেদারল্যান্ড। নেদারল্যান্ডে নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সবকিছুর আগে একটি মেয়েকে ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য জানতে হয় কীভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, ভালো গ্রেড পেতে হয়, কীভাবে বিভিন্ন বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে হয়, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হতে হয় এবং আবেগের চেয়ে চিন্তাশক্তির বেশি ব্যবহার করতে হয়। একটি ভালো চাকরি প্রাপ্তিকে জীবনধারণের আসল লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়। মনে হয়, মেয়েদের সকল কল্যাণ এর মধ্যে নিহিত। কেননা, কেউ দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করতে চায় না এবং কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল হয়েও থাকতে চায় না। তারপরও বিষয়টি হলো এটি আমাদের মেয়েদের জন্য ততটা লাভজনক নয় যতটা আমাদের অর্থনীতির জন্য লাভজনক। নারীদের বাড়িতে অবস্থান করে নিজেদের সন্তানসন্ততিদের লালন-পালন করাটা আমাদের অর্থনীতির জন্য সহায়ক কোন বিষয় নয়। কাজ সম্পাদনের জন্য আমাদের অর্থনীতির প্রয়োজন যত কম সম্ভব বেতনের বিনিময়ে কর্মীর সরবরাহ। আমাদের অর্থনীতি এই মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, কীভাবে অন্যের দ্বারা লাভবান হওয়া যাবে যাতে বার্ষিক লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

আজকাল নেদারল্যান্ডের মুসলিম মেয়েরা ও মুসলিম নারীরা মনে হয় ইসলামের প্রধান মূল্যবোধসমূহকে ভুলে যাচ্ছে। তারা ইসলামিক জীবন যাত্রার ধরন ভুলে গেছে যেখানে মানুষের একে অপরের সাথে দেখা করার, অসুস্থদেরকে সেবা করার, পারস্পরিক সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করার, অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও দান করার মতো কাজের জন্য সময় থাকত। অথচ এখন সেই সময় নেই। কর্মব্যস্ততা আমাদের দিবসগুলোর প্রথমভাগ থেকেই শুরু হয়। মায়েদেরকে তাড়াতাড়ি করে বাচ্চাদেরকে ডে-কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যেতে হয় যাতে তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে সঠিক সময়ের মধ্যেই পৌঁছতে পারে। যখন তাদের কাজ শেষ হয় তখন কিছু কেনাকাটা করা বা

দ্রুত খাবার তৈরির জন্য তাদের হাতে খুব কম সময় থাকে। একত্রে ঘণ্টাখানেক সময় কাটানোর পরই সন্তানদেরকে ঘুমাতে যেতে হয়। পরের দিন ওঠার পর আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই অবস্থায় সন্তানরা সন্তোষজনক কোন আচরণ শেখে না, যেহেতু তাদের সামনে কোন প্রশংসনীয় আচরণ নেই। তারা ধৈর্যধারণ করা শেখে না যেহেতু তাদের জন্য কোন ধৈর্যই নেই। ক্লান্ত মায়েরা তাদের অতৃপ্ত শিশুদের সাথে সময় কাটানো, তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, তাদের সাথে বেড়াতে যাওয়া, তাদের সাথে ব্যায়াম করা বা তাদের সাথে খেলাধুলা করার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ট্যাব কিনে দেয়। তারা শিশুদের জন্য নিজেরা কুরআন তেলাওয়াত না করে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের সফ্টওয়্যারযুক্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস কিনে দেয়। অথচ পরিবারগুলোর সদস্যসংখ্যাও বেশি নয়। একটি ডাচ পরিবারে গড় সন্তানদের সংখ্যা ১.৮।

মানুষের কল্যাণের চেয়ে চাকরি প্রাপ্তি এবং অর্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এজন্য শিশুরা তাদের চারদিকে কোন আদর্শ দেখতে পারে না। শিশুদের জীবনে টেলিভিশনের সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তারকারী উপস্থিতি রয়েছে। আর টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো সবসময় স্বার্থপরতা ও বিলাসী জীবন যাপন পদ্ধতিকে প্রচার করে। মুসলমানরাও এই ধরনের জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। কারণ, তারা সেসকল লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত যারা এমন ধরনের জীবনযাত্রার পদ্ধতি তৈরি করেছে এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কেন তারা এই জড়বাদী জীবনযাত্রার অন্তঃসারশূন্যতা দেখতে পারে না? এর কারণ হলো, তারা কখনই এমন জীবন যাপনের স্বাদ পায় নি যে জীবন ভালোবাসা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থায় পরিপূর্ণ। তারা কি ভুলে গেছে যে, ইসলামি মূল্যবোধে পরিপাটি ও সুদর্শন হওয়ার চেয়ে মায়া-মমতার মূল্য অনেক বেশি, চিন্তাশীলতা বুদ্ধিমত্তার ঊর্ধ্বে, ন্যায়ের জন্য কামনা একজনের জীবনকে আলোকিত করে? তারা কি ইতিহাসের মহান নারী ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদকে নিয়ে চিন্তা করে না? তিনি কোন পেশার সাথে জড়িত ছিলেন না, আর কোন ডিগ্রি অর্জন বা আয়ের সাথেও জড়িত ছিলেন না। এর পরিবর্তে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কের বন্ধনে জড়িত ছিলেন। ফাতিমা : মুহাম্মাদ (সা.)-এর কন্যা; ফাতিমা– হযরত আলীর স্ত্রী বা ফাতিমা– হাসানাইন (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন)-এর মা। সকল মুসলমানই তাঁর ব্যক্তিত্বের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাঁর চেতনা দ্বারা সমাজের প্রতি বিশাল অবদান রেখেছেন এবং তিনি ছিলেন আদর্শ কন্যা, স্ত্রী এবং মা। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে তাঁর বাবা, স্বামী ও সন্তানদের অনুপম ভালোবাসায় সিক্ত করেছে। হৃদয়ের গভীরে সকল মানুষই ভালোবাসা ও সম্মান পেতে চায়

যেমনভাবে হযরত ফাতিমা তাঁর নিজের পরিবারের সবার কাছ থেকে ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোতে অনেক অসদাচরণ, হিংসা-বিদ্বেষ, মৌখিক নির্যাতন, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও দেখা যায়। অথচ ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'মানুষের রুপা এবং সোনার যতটা না প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন উত্তম নীতি ও আচরণ।'

অনেক ইসলামি মূল্যবোধকে আমাদের মানসিকতায় হত্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : এই মানসিকতা যে, সত্যের জন্য লড়াই ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ স্কুলে ভালো গ্রেড পাওয়া। তেমনিভাবে যে বিপদে পড়েছে তাকে যে কোনভাবে হৃদয় থেকে সাহায্য করা অথবা শান্তি, ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থপরতার কথা প্রচার করা। যদিও এগুলো ইসলামি শিক্ষার ভেতরে সবচেয়ে উত্তম, যা আমরা ফাতিমা যাহরা (আ.)-এর জীবনে দেখতে পাই। তিনি ইসলামের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁর বিবাহের পোশাক বিবাহের রাত্রিতেই দান করে দিয়েছিলেন এবং প্রতিদিন যে পোশাক পরিধান করতেন সেই পোশাকই পরিধান করেছিলেন এ চিন্তা ছাড়াই যে, লোকে কী বলবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি তাঁর কাছে অন্য সকল কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

হযরত ফাতিমা তাঁর পিতার কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর একজন বড় সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি খুবই আবেগপ্রবণ ছিলেন ও যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁকে মেনে চলতেন– যা তাঁর পিতার হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিত। এজন্যই মহানবী (সা.) বলেছিলেন : 'যে ফাতিমাকে আনন্দিত রাখে সে আমাকে ও আল্লাহকে আনন্দিত করে। আর যে ফাতিমাকে দুঃখ দেয় সে আমাকে ও আল্লাহকে দুঃখ দেয়।'

ভালোবাসা ও স্নেহপরায়ণতার ক্ষমতা সমাজের অভ্যাসের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় নি। আল্লাহ কি নারীদেরকে মায়ামমতার আধার হিসেবে সৃষ্টি করেন নি, যাতে তারা তাদের চারপাশে যারা রয়েছে তাদের প্রয়োজনে সাড়া দেয়, বিশেষ করে যারা শিশু ও দুর্বল?

কিন্তু নেদারল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির প্রয়োজন হলো কর্মীর। তাই তা ছোট শিশুদের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দেয় না যে, শিশুদের সুন্দর বাড়ি থাকবে যেখানে কেউ একজন তাদের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থান করে তাদেরকে সঙ্গ দেবে ও তাদেরকে জীবনের পথে চলতে সাহায্য করবে।

শিশুদের প্রতি তাদের মায়েদের ভালোবাসা ও বিশেষ মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, সে স্বাভাবিক ভাবেই তার সন্তানকে ইসলামি জীবন যাপনে বেড়ে

উঠতে দেখে খুশি হয়। অথচ এই বিষয়টি নেদারল্যান্ডে হতাশাজনক। যেসব মুসলিম পিতা-মাতা ডাচ ভাষা বলে না তাদেরকে তাদের সন্তানদের ২ বছর বয়সে ডাচ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রাক বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়। অবশ্যই তাদের শিশুরা এত কম বয়সে তাদের মায়েদের থেকে পৃথক হওয়ায় এবং সাধারণ পরিবেশে এসে অনেক উদ্বিগ্নতা ও ভীতি অনুভব করে। এই প্রাক বিদ্যালয়গুলোর শিশুদের মাঝে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার কোন লক্ষ্যই নেই। তাদের উদ্দেশ্য হলো যে বয়সে বিদ্যালয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করায় বাধ্য করা উচিত নয় সেই বয়সে শিশুদের মাথায় জ্ঞানবিদ্যা ঢুকিয়ে দেয়া। ইসলামের রীতি অনুযায়ী সন্তানদের জন্য তার মা হলো প্রথম বিদ্যালয় যেমনটা হযরত ফাতিমা যাহরা ছিলেন তাঁর সন্তানদের জন্য।

ফাতিমা যাহরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী ছিলেন, যিনি প্রচলিত কোন শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে ছিলেন না, কিংবা কোন চাকরির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, সমাজের একজন কর প্রদানকারীও ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য জীবন যাপন করতেন। অন্যের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করতেন। অন্যের ভালোর জন্য নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে কম গুরুত্ব দিতেন। তারপরও যখন তাঁর স্বামীর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল তখন তিনি প্রতিবাদ করতে পিছ-পা হন নি– মসজিদে গিয়ে জনতার সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাঁর চারপাশের লোকদের বিবেককে জাগ্রত করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন নি বা হীনমন্যতায় ভোগেন নি।

হযরত ফাতিমাকে জীবন যাপনের জন্য পেশাজীবী হয়ে অর্থ উপার্জনের শিক্ষা দান করা হয় নি। কিন্তু তিনি আল্লাহ সম্পর্কে জানতেন এবং জানতেন যে, তিনি এই বিশ্ব এবং মহাজগৎ ন্যায় এবং বদান্যতা দিয়ে ঘেরা একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানতেন যে, এই প্রক্রিয়ায় পুরুষ এবং নারী একই রকম নয়। তারা উভয়ই সৃষ্টি হয়েছে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য।

বর্তমানে একজন অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করে এবং শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং অপরজনও কাজ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মনোরম রাখতে এবং অন্যদের নিত্য দিনের বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

যে নারী তার কর্মক্ষেত্রের কাজের জন্য প্রশিক্ষিত, কিন্তু এসব ব্যাপারে প্রশিক্ষিত নয় তার পক্ষে এটি সহজ নয়। সে তার বাড়িতে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। যে তার নিজের সন্তানদের নিকট নিজেকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত করানোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, তার জন্য এটি বহন করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অনেক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিশুদের ওপর পিতামাতার ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মায়েরাই তাদের সন্তানদের সাথে অধিকাংশ সময় ব্যয় করে। ইসলামের আইন মোতাবেক যেহেতু সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখা তার কর্তব্য তাই তাকে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে। ইসলামি আইন তাকে তার স্বামী কর্তৃক তার ও তার সন্তানদের ভরণ পোষণ পাবার অধিকার দিয়েছে। নারীদের মা হওয়া এবং বংশধারা অব্যাহত রাখার মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সন্তানদেরকে ভালোবাসা দেয়া এবং তাদেরকে লালন-পালন ও মূল্যবোধ এবং নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করার জন্য– যা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে রক্ষা করবে। তাদের হৃদয় প্রবীণ ও দুর্বলদের জন্য সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। প্রকৃত ঘটনা হলো যে, একটি সমাজ সবাইকে বিশ্বাস করায় যে, পেশাদার হওয়াই কোন ব্যক্তির যোগ্যতার নিরূপক। উপযুক্ত চাকরির জন্য চেষ্টা করা সর্বোচ্চ প্রাপ্তি– যা একজন ছেলে বা মেয়েকে দুর্দশা থেকে রক্ষা করবে– এ বিষয়টি তাদেরকে অর্থনৈতিক বিভ্রান্তিতে ফেলে দিচ্ছে।

আমাদের মুসলমানদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, এই ধরনের বিত্ত ও আনন্দ কামনা করা থেকে এবং ইসলামি মানদণ্ডের পরিবর্তে মানুষকে সন্তুষ্ট করা আমাদের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য থেকে বিস্ময়কর। সমাজের ব্যাপারে ইসলামের সবচেয়ে বেশি প্রজ্ঞাময় এবং মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং এটি অর্জন সম্ভব নয় স্বার্থপরতা এবং প্রত্যেকে কেবল নিজের জন্য আর স্রষ্ট সবার জন্য– এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পুরুষ এবং নারী উভয়েরই কম উপার্জনের বিষয়টি মেনে নেয়া উচিত– দুজনেরই কর্মক্ষেত্রে গমনের পরিবর্তে এবং তাদেরকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অংশ এবং দায়িত্ব রয়েছে। উভয়েরই উচিত অন্যজন যা করছে সেটাকে স্বাগত জানানো। তাদের আচরণ তাদের শিশুদের মানসিকতার ওপর যে অপরিমেয় প্রভাব রাখতে পারে সে সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। ভালোবাসা, একে অপরকে সম্মান করা এবং সবসময় আল্লাহর প্রশংসা করা এবং পরকালকে স্মরণে রাখা– এটিই ইসলামি জীবন যাত্রার ধরন। যা আমরা ফাতিমা আয যাহরার নিকট থেকে শিখতে পারি।

জীবনী

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন একনিষ্ঠ যুবক সাহাবী

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকজন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী যুবক সাহাবী

মূল : মুহাম্মাদ আলী চানারানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খালিদ ইবনে সাইদ– উন্নত চরিত্রের অধিকারী যুবক

একটি ভাগ্যনির্ধারণী স্বপ্ন

প্রতিটি মানুষের জীবন সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে; যদি সে সেই অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তা লাভজনক হয় এবং কাঙ্ক্ষিত ফল দেয়। কখনো এই বিষয়গুলো প্রকাশিত হয় একটি স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা অন্তর্জগতে কোন সত্য নিদর্শন পরিস্ফুট হওয়ার মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে তা বাস্তব সুস্পষ্ট ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মানুষের অন্তর্জগতে পরিস্ফুট এসব নিদর্শনকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, কেননা, সেগুলো মানুষকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খালিদ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার প্রকৃতিও এরূপই ছিল। কারণ, এটি তাঁকে পার্থিব ও অপার্থিব চিরস্থায়ী সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। যখন মহানবী (সা.) কোন কোন ব্যক্তিকে একান্তে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত খুব বেশি সংখ্যক মানুষ ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি সেই সময় খালিদ একদিন স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটি বড় ও বিপজ্জনক আগ্নেয়গিরির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন। আগুনের ফুলকি নিচ থেকে ওপরে উঠছিল। আর তাঁর পিতা তাঁকে সেই আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য চেষ্টা করছিল। মহানবী (সা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খালিদকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন এবং তাঁকে সেই আগুনে নিপতিত হওয়া হতে রক্ষা করছেন।

খালিদ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং বললেন : 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, এই স্বপ্ন সত্য ও সঠিক। পরদিন সকালে তিনি হযরত আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। হযরত আবু বকর বললেন : 'তোমার স্বপ্ন ভবিষ্যতের সুসংবাদ বহন করছে। তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো মহানবী (সা.) তোমাকে আগুনে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করছেন, কারণ, তুমি তাঁর ঐশী আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিতে ও তাঁকে অনুসরণ করতে চলেছ, যেখানে তোমার পিতা অবিশ্বাসী ও মুশরিকই থেকে যাবে।'

এই কথোপকথনের পর হযরত খালিদ দ্রুত মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যান এবং তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন : 'হে মুহাম্মাদ! আপনি মানুষকে কিসের প্রতি আহ্বান করছেন এবং আপনার ধর্ম কী?' রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন : 'আমি মানুষকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করার দিকে আহ্বান জানাই, যাঁর কোন শরীক নেই। আমি মানুষকে আমার নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানাই এবং তাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করি। কারণ, সেগুলো শুনতে ও দেখতে পারে না আর মানুষের উপকার অথবা ক্ষতি সাধন করতে পারে না।'

মহানবী (সা.)-এর শক্তিশালী ও অকাট্য যুক্তিতে খালিদ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন ও উদ্বুদ্ধ হন। কারণ, তখন তিনি তাঁর স্বপ্নের একটি অর্থ খুঁজে পান। তিনি সর্বান্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমাইয়্যা বংশের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করায় মহানবী (সা.) খুব খুশি হন।

যখন খালিদের পিতা এ ব্যাপারে জানতে পারল তখন সে তার অন্য সন্তান ও দাসদেরকে ডাকল। ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে ও থুথু ফেলে তিনি তাদেরকে আদেশ দিল যেন তারা বেরিয়ে পড়ে এবং খালিদ যেখানেই থাকুন না কেন, তারা যেন তাঁকে ধরে নিয়ে আসে। তারা খালিদের খোঁজে বেরিরে গেল এবং তাকে খুঁজে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসল। খালিদ ও তার পিতার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় ছিল। যখন খালিদের পিতা তার সন্তানকে দেখল তখন তার দিকে ধেয়ে গেল। সে একটি লাঠি দিয়ে খালিদের মাথায় ও মুখে এমনভাবে আঘাত করল যে, লাঠিটি ভেঙে গেল। তারপর সে ক্রোধে চিৎকার করে বলল : 'তুমি কি মুহাম্মাদকে অনুসরণ করা শুরু করেছ, যখন তুমি দেখছ যে, সে একটি নতুন ধর্মসহযোগে–যে

ধর্ম সে এনেছে–তার নিজ গোত্র কুরাইশের বিরুদ্ধে উত্থান করেছে এবং তাদের উপাস্য ও পূর্বপুরুষদেরকে মন্দ বলছে?'

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী খালিদ ভয় ও দ্বিধাহীনভাবে জবাব দিলেন : 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর আহ্বানে সত্য ও সঠিক এবং এ কারণেই আমি তাঁকে অনুসরণ করছি।' খালিদের পিতা ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলল : 'তুমি যেখানে খুশি যেতে পার, আজ থেকে আমি তোমাকে ত্যাজ্য করলাম। তুমি আমার কাছ থেকে কোন কিছুই পাবে না।' খালিদ বললেন : 'যদি আপনি আপনার খাদ্য ও পানি বন্ধ করে দেন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব না। কারণ, আল্লাহ আমাকে খাদ্য দেবেন ও আমার জীবন ধারণের ব্যবস্থা করবেন।' এই কথোপকথনের পর, তাঁর পিতা তার অন্য সন্তানদেরকে তাঁকে বন্দি করার নির্দেশ দিল । তারা তাঁকে বন্দি করল। সেখানে তিনি উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে তিনদিন খাদ্য ও পানি ছাড়া বন্দি অবস্থায় ছিলেন যতক্ষণ না তিনি সেখানে থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁর পিতা তার সন্তানদের নির্দেশ দিল : 'যে খালিদের সাথে কথা বলার সাহস দেখাবে তার সাথেও একই আচরণ করা হবে।' একারণে খালিদ তাঁর পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মহানবী (সা.)-এর নিকট আশ্রয় নেন। এরপর থেকে তাঁকে সবসময়ই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে দেখা যেত।

খালিদের ইসলাম গ্রহণের কথা যখন সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল তখন কেবল তাঁর পিতাই তাঁকে হুমকি প্রদান করে নি এবং তাঁর সাথে মন্দ আচরণ করে নি; বরং কুরাইশ গোত্রের নেতারাও তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার সাথে মন্দ আচরণ শুরু করে। কিন্তু খালিদ দৃঢ়তার সাথে সকল ধরনের চাপ উপেক্ষা করেন এবং ইসলামের শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করেন।

একদিন আবু সুফিয়ান খালিদকে দেখে বলল : 'হে খালিদ! মুসলমান হয়ে তুমি তোমার পরিবারকে সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছ।' খালিদ তাকে জবাব দিলেন : 'আপনি ভুল বলছেন। মুসলমান হয়ে আমি আমার পরিবারের মর্যাদার ভিত্তিকে শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ করেছি।' আবু সুফিয়ান এমন ধারালো উত্তরের জন্য কখনই প্রস্তুত ছিল না। সে খালিদকে হুমকি দিয়ে বলল : 'তুমি একজন অপরিপক্ব

যুবকমাত্র। আমি জানি যে, যদি তোমাকে মৃদু শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়া যায় তাহলে তুমি তোমার নতুন বিশ্বাস থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।'[১]

বিভিন্ন দৃশ্যপটে ও ঘটনায় খালিদের উপস্থিতি

ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিটি ঘটনায় খালিদসক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এখানে আমরা সেসব ঘটনার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করব।

ইথিওপিয়ায়[২] হিজরত

যখন মুশরিক ও মূর্তিপূজকরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করল তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন যাতে তাঁরা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন এবং সেখানকার ন্যায়পরায়ণ বাদশা নাজ্জাশীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে মুসলমানদের একটি দল ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের মধ্যে মক্কাবাসী সম্পর্কে একটি মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়ে (যে, মক্কার অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে)। এই গুজবের কারণে হিজরতকারীদের একটি অংশ মক্কায় ফিরে আসেন। যখন তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁরা জানতে পারেন যে, সে কথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে ইথিওপিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় হিজরত নামে পরিচিত। খালিদ তাঁর স্ত্রী ও ভাইসহ হাবাশায় হিজরত করেন। তাঁরা সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন এবং খায়বার বিজয়ের পর তাঁরা মদীনায় গমন করেন।

মহানবী (সা.)-এর অনুলেখক ও সচিব

খালিদ ইবনে সাইদ মহানবী (সা.)-এর অন্যতম অনুলেখক ও সচিব ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর অনেক চিঠি, যেগুলো মহানবী (সা.) বিভিন্ন গোত্রের প্রতি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরণ করতেন সেগুলো মহানবী (সা.) মুখে বলতেন আর খালিদ

---

১. তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৪, উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২; আল ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২; হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১; আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬; আদ দারাজাতুর রাফিয়্যাহ, পৃ. ৩৯২; ইনসাবুল আশরাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫; ইবনে হিশাম, সিরাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫

২. ইথিওপিয়া পূর্বে হাবাশা বলে পরিচিত ছিল।– অনুবাদক

সেগুলোকে হাতে লিখে প্রেরণ করতেন। হযরত খালিদের মহান ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য এটিই যথেষ্ট। খালিদের হস্তলিখিত চিঠির মাধ্যমে অনেক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে সাকিফ গোত্রের নাম উল্লেখ করা যায়।

ইয়েমেনের দায়িত্বশীল

খালিদ মহানবী (সা.) কর্তৃক ইয়েমেনে কর আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন। যখন তিনি ইয়েমেনে গমন করেন তখন মহানবী (সা.) তাঁকে নির্দেশ দেন : 'যখনই তুমি কোন আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যাবে এবং তাদেরকে আযান দিতে দেখবে তাদের ওপর অত্যাচার করবে না। অন্যদিকে যখনই তুমি এমন কোন গোত্রের পাশ দিয়ে যাও যারা আযান উচ্চারণ করে না, তাহলে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে (এবং তাদেরকে আযান দেয়া শিক্ষা দেবে)।'

খালিদ মহানবী (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

আলী (আ.)-এর সাথে

যেহেতু হযরত খালিদ সবসময় রাসূলুল্লাহ ও তাঁর পরিবারের (আহলে বাইতের) প্রেমিক ছিলেন সেহেতু তিনি কখনই আলী (আ.)-এর বিরোধীদের সাথে আপস করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি সবসময় হযরত আলীকে সমর্থন করেছেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে আলী (আ.) ও আহলে বাইত সম্পর্কে খালিদ ইবনে সাইদ থেকে অনেক কার্যকর হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১]

একটি মূল্যবান পরিসমাপ্তি

খালিদ ঘরে বসে থাকার মতো মানুষ ছিলেন না; বরং তিনি ইসলামের সমৃদ্ধির জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর দেহ ও অন্তর দিয়ে প্রতিটি যুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন এবং সবসময় তাঁর জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অবশেষে 'মারজ আল সাফফার' নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। এই যুদ্ধের

১. ইরশাদ, মুফিদ, পৃ. ৮৪; কামুস আর রিযাল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮০; আদদারাজাতুর রাফিযাহ, পৃ. ৩৯৩; উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩; আল ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০; হায়াতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭; তানকিহ আল মাকাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১; আল ইহতিজাজ, তাবারসী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭; বিহারুল আনওয়ার, ২৮তম খণ্ড, পৃ. ২০২; শারহে নাহজুল বালাগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮

আগের রাতে খালিদ একটি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি শহীদ হতে চলেছেন। তিনি এই স্বপ্ন অন্যদের কাছে বর্ণনা করেন। যুদ্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে তিনি শহীদ হন। এই যুদ্ধ রোমান ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত হয়।[১]

হযরত খাব্বাব ইবনে আর্‌ত– লোহার মতো মজবুত যুবক

হযরত খাব্বাব ইবনে আরতের উপনাম ছিল আবু ইয়াহইয়া অথবা আবু আবদিল্লাহ। তিনি মহানবী (সা.)-এর অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন এবং প্রথম দিকে মুসলমান হওয়া ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি মক্কায় খুজাআ অথবা বনি যুহরার একজন নারীর গৃহে দাস হিসেবে জীবন যাপন করতেন। তাঁর কাজ ছিল তরবারি তৈরি ও মেরামত করা। তিনি মহানবী (সা.)-এর পরিচয় সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে অবগত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা পোষণ করতেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতি মিশনের শুরুর দিকেই খাব্বাব তাঁর অন্তরের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার কারণে মুসলমান হন।

কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেছেন : 'তিনি ইসলাম গ্রহণকারী ষষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর বিশ্বাস এত বেশি শক্তিশালী ও দৃঢ় ছিল যে, কাফেদের কঠোর নির্যাতনের পরও তিনি তাঁর ঈমান পরিত্যাগ করেন নি।

মক্কার মুশরিকরা অন্যান্য দাসের মতো তাঁর সাথেও কঠোর আচরণ করত। তাঁকে ধরে নিয়ে তাঁর শরীরে স্টিলের বর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত পাথরের ওপর শুইয়ে দিত এই উদ্দেশ্যে যে, যেন তিনি তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করেন। যখন তারা লক্ষ্য করল যে, এ ধরনের নির্যাতন তাঁর ওপর কোন প্রভাব ফেলছে না, তখন তারা জ্বলন্ত কাঠ দ্বারা তাঁর শরীরে ছ্যাঁকা দিত।

খাব্বাব নিজেই বর্ণনা করেন : 'নির্যাতন চলাকালীন একদিন কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি এসে আমার বুকের ওপর একটি জ্বলন্ত কাঠ রাখল। তারপর সে তার পা দিয়ে কাঠটি চেপে ধরল, আমার শরীরের চামড়ায় ভিজে সেই জ্বলন্ত কাঠ নিভে গেল।' এই ক্ষত চিহ্নগুলো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর শরীরে দেখা যেত।

---

১. তারিখে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৮০, ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২; ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০; তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৯

যখন হযরত উমর খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন তিনি একদিন খাব্বারের সাথে দেখা করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিনগুলোতে নির্যাতনের ফলে যে ক্ষত চিহ্নগুলো তাঁর শরীরে হয়েছিল সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। খাব্বাব তাঁকে বললেন : 'আমার পিঠের দিকে লক্ষ্য করুন।' যখন উমর সেই চিহ্নগুলো দেখলেন তখন বললেন : 'আমি এরকম আগে কখনও দেখি নি।'

শাবী বলেন : 'যেসব ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে মুশরিকদের নির্যাতন সহ্য করেন এবং কখনই তাঁদের ধর্ম পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না খাব্বাব ছিলেন তাঁদের অন্যতম ব্যক্তি। যেসব মুশরিক এটি দেখত তারা উত্তপ্ত পাথর তাঁর শরীরে চেপে ধরত যতক্ষণ না তাঁর মাংস গলে যায়।'

খাব্বাব উম্মে আম্মার নামক এক নারীর গৃহে দাস হিসেবে কাজ করতেন। যখন সেই নারীর কাছে তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর পৌঁছল তখন থেকে সে প্রতিদিন তাঁকে নির্যাতন করত। সে একটি লোহা গরম করত এবং খাব্বাবের মাথার ওপর রাখত যাতে তিনি মহানবী (সা.) ও তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করেন।

হযরত খাব্বাব এধরনের নির্যাতনের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করলেন। মহানবী (সা.) খাব্বারের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। এই দোয়া করার পর সেই নারী ভীষণ মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। তার মাথা এত বেশি ব্যথা করত যে, সে কুকুরের মতো কাতর স্বরে চিৎকার করত। লোকজন তাকে বলল যে, এই মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কাউকে একটি লোহা উত্তপ্ত করে তা দ্বারা মাথায় সজোরে আঘাত করতে হবে। এরপর ওই নারী হযরত খাব্বাবকে একটি লোহা গরম করে তার মাথায় সজোরে আঘাত করার জন্য নির্দেশ দেয়।

হযরত আলী (আ.) যখন সিফফিনের যুদ্ধে যান তখন হযরত খাব্বাব অসুস্থ ছিলেন। এজন্য তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। এই যুদ্ধের সময়কালেই তিনি কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। যখন আলী (আ.) সিফফিন থেকে কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং খাব্বাবের মৃত্যুর সংবাদ অবগত হন তখন তিনি বলেন : 'আল্লাহ খাব্বাবকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। কেননা, তিনি তাঁর নিজের অনুরক্তির জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আনুগতের সাথে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে মহান পুরস্কার দান করুন। কারণ, তাঁর জীবন ধারণের জন্য যা ছিল সেটাতেই তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন।'

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত খাব্বাব ৩৭ হিজরিতে মারা যান এবং তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে কুফা নগরীর বাইরে করব দেয়া হয়। এটা বলা হয়েছে যে, তিনিই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাঁকে কুফা নগরীর বাইরে কবর দেয়া হয়। কারণ, এর পূর্ব পর্যন্ত যেসব মুসলমান মারা যেতেন তাঁদেরকে নিজেদের গৃহে অথবা বাড়ির নিকটস্থ রাস্তার পাশে দাফন করা হতো। খাব্বাবের মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁর পথ অনুসরণ করেন এবং তাঁদের মৃতদেরকে নগরীর বাইরে দাফন করা শুরু করেন।[১]

হযরত যায়েদ বিন হারেসা– যিনি কখনই নবীজির অবাধ্য হন নি

হযরত যায়েদ বিন হারেসা ইবনে শারাহবিল কালবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম সম্মানিত সাহাবী ছিলেন এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খাদিজা (আ.)-এর ভাগ্নে হাকিম ইবনে হিযাম, যখন সিরিয়ায় বাণিজ্য সফর থেকে ফিরে আসেন তখন অন্যান্য দাসের সাথে হযরত যায়েদকেও মক্কায় নিয়ে আসেন। যায়েদ তখন একজন কিশোর মাত্র। মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী হযরত খাদিজা একদিন হাকিম ইবনে হিযামের বাড়িতে বেড়াতে যান। হাকিম তাঁর ফুফুকে বলেন : 'প্রিয় খালাম্মা! আপনি এদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে নিজের খেদমতের জন্য বেছে নিতে পারেন।' হযরত খাদিজা যায়েদকে পছন্দ করেন এবং তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়েদকে দেখেন তখন যায়েদকে তাঁকে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। হযরত খাদিজা যায়েদকে মহানবী (সা.)-কে উপহার দেন। মহানবী (সা.) আল্লাহর খাতিরে তাঁকে মুক্ত করে দেন। এই ঘটনা রাসূলের নবুওয়াতের অনেক বছর আগে সংঘটিত হয়।

হযরত যায়েদের পিতা হারেস তাঁর সন্তানের বিচ্ছেদে ক্রন্দন করতেন। তিনি যেসব কবিতা রচনা করতেন ও জনসাধারণের সামনে পাঠ করতেন সেসব কবিতায় এ ব্যাপারে অনুযোগ করতেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, যায়েদ মক্কায় মহানবী

১. আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩; সিফাতুল সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮; যারকুলি, আল আলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১; আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩; বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩২৫, ৩৩৯; আল খিসাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০; সাফিনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩

(সা.)-এর সাথে বসবাস করছেন তখন তিনি মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মক্কায় আসেন। তিনি মহানবীর সাথে দেখা করে তাঁর আদরের সন্তানকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়েদকে বলেন : 'তোমার যা ইচ্ছা তা করতে পার; তুমি চাইলে আমাদের সাথে যতদিন খুশি ততদিন থাকতে পার অথবা তুমি তোমার পিতার কাছে ফিরে যেতে পার।' যায়েদ বললেন : 'আমি এখানে থাকব এবং আপনার সাথে থাকব।' যায়েদ ষষ্ঠ হিজরি পর্যন্ত রাসূলের সাথে ছিলেন যতদিন না তিনি এই হিজরিতে মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি সেই যুদ্ধে মুসলিম সেনাদলের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বিশ্‌র– দৃঢ় বিশ্বাসের যুবক

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র আশহালী খাযরাজী ছিলেন মদীনার আনসার এবং মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী। তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায়ই মহানবী (সা.)-এর পাশে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যেত।

যেসব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেসব গোত্র থেকে যাকাত ও সাদাকাহ গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি মুসলমানদের অন্যতম নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। তিনি ১২ হিজরিতে শাহাদাতবরণ করেন।[২]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী বলেন : 'কাফিরদের মোকাবিলায় যাতুর রাকা যুদ্ধে যখন আমরা নাখ্‌ল নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমরা সেখানে আমাদের ক্যাম্প স্থাপন করলাম। সেখানে একজন মুসলমান একজন কাফির নারীকে আটক করে। সেই নারীর স্বামী বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে তার স্ত্রীকে নিখোঁজ দেখতে পায়। সে তাকে খুঁজতে থাকে। যখন সে জানতে পারে যে, তার স্ত্রীকে বন্দি করা হয়েছে

১. আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৩; সিফাতুল সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭; তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩; আল রাউযুল উনফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪; যারকুলি, আল আলাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭; ইবনে হিশাম, আস সিরাহ আন নাবাভিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭; নিহায়াতুল আরাব, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১৬৪; উয়ুনুল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪; তারিখুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮

২. যারকুলি, আল আলাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; ইবনে সাদ, তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭; আল ইসাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯০

তখন সে শপথ নিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে একজন মুসলমানকে অথবা রাসূলের একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীকে হত্যা করবে ততক্ষণ সে বাড়িতে ফিরবে না। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বের হলো এবং মুসলমান সেনাদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য ওঁত পেতে থাকল।

মহানবী (সা.) তাঁবুগুলোর নিকট এলে বললেন : 'আজকে রাতে আমাদের পাহারাদার কে হবে?' মুহাজিরদের মধ্য থেকে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং আনসারদের মধ্য থেকে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র থেকে স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তারপর তাঁরা উপত্যকার প্রবেশ পথে গেলেন এবং নিজেদের জায়গায় অবস্থান নিলেন। আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র মাঝরাত পর্যন্ত পাহারার দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর আম্মার সূর্যোদয় পর্যন্ত পাহারা দেবেন। এজন্য হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রথমে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিলেন। আর হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র তাঁর রাতের নামায শুরু করলেন যাতে অলস সময় কাটানোর পরিবর্তে রাতের সময়টুকু ইবাদতে অতিবাহিত করতে পারেন।

এসময়ে সেই কাফির সেখানে পৌঁছল এবং আব্বাদকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করল। যখন সে নিশ্চিত হলো যে, নামাযরত ব্যক্তিটি মুসলমান তখন সে একটি বর্শা নিক্ষেপ করল। বর্শা আব্বাদের শরীরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করল, কিন্তু তিনি বর্শাটি বের করে পুনরায় নামাযে মনোযোগী হলেন। লোকটি আরেকটি বর্শা নিক্ষেপ করল যেটি তাঁর দেহে আরেকটি ক্ষত সৃষ্টি করল। আব্বাদ রুকুতে গেলে সে আরেকটি বর্শা নিক্ষেপ করল। তিনি কোনভাবে তাঁর নামায শেষ করলেন এবং আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে বললেন : 'আম্মার উঠুন! নিজ পায়ে দাঁড়ানোর মতো আর কোন শক্তি আমার নেই।' আম্মার জেগে উঠলেন। যখন কাফির লোকটি দেখল যে, প্রহরী একজন নয়, দুইজন, তখন সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আম্মার দেখলেন যে, আব্বাদের ক্ষতস্থান থেকে ভীষণভাবে রক্ত ঝরছে। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন : 'সুবহানাল্লাহ! যখন প্রথম বর্শা আপনাকে আঘাত করেছিল তখন কেন আমাকে জানান নি?' আব্বাদ জবাব দিলেন : 'আমি মহিমান্বিত কোরআনের একটি সূরা (কাহ্‌ফ) তেলাওয়াত করছিলাম এবং একে অসমাপ্ত রাখতে চাচ্ছিলাম না। আমার অন্তর সূরাটি তেলাওয়াত বন্ধ করতে দিতে চাচ্ছিল না। কিন্তু যখন আমি বুঝলাম যে, একের পর এক বর্শা নিক্ষেপ করা হচ্ছে তখন আমি আপনাকে জাগিয়ে তুললাম।

আল্লাহর কসম, আমি যদি এ ভয় না পেতাম যে, আমি আমার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছি, তাহলে আমি আপনাকে জাগাতাম না, আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই নেয়ামতসম্পন্ন সূরাটি তেলাওয়াত করে যেতাম।'[১]

হযরত জাবির– মহানবী (সা.)-এর বার্তাবাহক

আবদুল্লাহর পুত্র হযরত জাবির ছিলেন মহানবী (সা.)-এর মদীনার আনসারদের অন্যতম। তিনি ছিলেন খাযরায গোত্রের। তাঁর কুনিয়া ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং আবু আবদুর রহমান। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী ছিলেন রাসূলের প্রসিদ্ধ সাহাবী ও সাহায্যকারীদের একজন। রাসূলের মদীনায় হিজরতের ষোল বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[২]

যখন মহানবী (সা.) হযরত মুসআব ইবনে উমাইরকে মদীনার অধিবাসীদের নিকট ইসলাম শিক্ষা দান ও ইসলামের প্রচারণার জন্য পাঠালেন তখন ইসলামের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয় যা ইসলামের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই কারণে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা অধীর হয়ে দিন গণনা করছিলেন এবং হজের মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যাতে তারা মহানবী (সা.)-কে নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। এই অধীর অপেক্ষার কাল অবশেষে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায় এবং কাফেলা মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এই কাফেলায় ৭৩ জন নও মুসলিম ছিলেন যাঁরা মহানবী (সা.)-কে প্রথমবারের মতো দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। ১৩ই যিলহজ রাতে হিজরতের ৩ বছর আগে নও মুসলিমরা আকাবার পাদদেশে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.)-এর সাথে কয়েক দফা বৈঠকের পর তাঁরা মহানবী (সা.)-এর হাতে বাইআত হন এবং সর্বাবস্থায় তাঁকে রক্ষা করা, নিরাপত্তা এবং সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এই বৈঠকের পর মহানবী (সা.) মদীনায় তাঁর অনুপস্থিতির

১. ইবনে হিশাম, আস সিরাহ আন নাবাভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০; তারিখে পায়াম্বারে ইসলাম, পৃ. ৩৭৩
২. যারকুলি, আল আলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪

সময় ১২ ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিনিধি ও প্রধান হিসেবে মদীনার অধিবাসীদের খেদমতে নিযুক্ত করেন।[১]

সেই রাতে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আনুগত্যের শপথ নেন তাঁদের মধ্যে ১৩ বছরের এক কিশোরও ছিলেন। তিনিই হযরত জাবের।[২]

তাঁর পিতার মতোই তিনিও প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ইসলামের ১৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলের পাশে থেকে যুদ্ধ করতেন। জাবির নিজেই বলেছেন যে, বদর ও উহুদ ছাড়া ইসলামের অন্য সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৩]

জাবিরের জ্ঞানের ব্যাপকতা

জাবির কেবল একজন যোদ্ধা ও সংগ্রামীই ছিলেন না, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহলে বাইতের নিকট থেকে প্রচুর কল্যাণ লাভ ও তাঁদের থেকে নিজ অন্তরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পদ সঞ্চিত রাখার কারণে তিনি ইসলামি জ্ঞানের নানা দিকে ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও বিশিষ্টতা অর্জন করেন। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেছেন যে, হযরত জাবির প্রচুর সংখ্যক হাদিস বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।[৪]

জাবির সেসব বিশিষ্ট পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন মানুষজন বিভিন্ন বিষয়ে অভিমত জানার জন্য যাঁদের শরণাপন্ন হতো।[৫] তিনি মসজিদের নববীতে জ্ঞানের আসর বসাতেন এবং জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতেন।[৬]

আহলে বাইতের সাথে ঐক্য ও সহমর্মিতা

মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ও সাহায্যকারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিলেন যাঁরা ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ ভালোবাসার পাত্র ও খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁদের অন্যতম হলেন জাবির। যে কারণে জাবির ভালোবাসার পাত্র তা হলো আহলে বাইতের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক ঐক্য ও

১. ইবনে সাদ, তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬১
২. উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭, আল ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩
৩. উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭, আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪
৪. আল ইসাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪, আয়ানুশ শিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬
৫. হায়াতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৭
৬. আ'য়ানুশ শিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭, যুরকুলি, আল আলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০

সহমর্মিতা। তিনি সকল সংবেদনশীল ও কঠিন পরিস্থিতিতে আহলে বাইতের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছেন।

এই কারণে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'জাবির আমাদের পরিবারের প্রতি ভীষণভাবে অনুগত ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।'[১]

মহানবী (সা.)-এর বেদনাদায়ক ওফাতের পর জাবির সর্বক্ষণ মহানবীর আহলে বাইতকে সঙ্গ দেন। বিদ্রোহী মুয়াবিয়ার সাথে আলী (আ.)-এর যুদ্ধে জাবির ইমাম আলী (আ.)-এর অন্যতম সমর্থক ছিলেন এবং সিফফিনের যুদ্ধে তিনি ইমাম আলীর সহযোদ্ধা ছিলেন।[২]

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার বাইরেও জাবির সবসময় ইমাম আলীকে সহযোগিতা করতেন। ইতিহাসের পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেছেন যে, জাবির চলাফেরার জন্য একটি লাঠি ব্যবহার করতেন এবং আনসারদের আলোচনা সভাগুলোতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মদীনার রাস্তায় হাঁটতেন। এসব সাধারণ আলোচনা সভায় তিনি বলতেন, আলী (আ.) দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যে কেউ তা অস্বীকার করে সে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে এবং এই সত্যকে ইচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান করে। হে আনসারগণ! তোমাদের সন্তানদেরকে আলীর প্রতি ভালোবাসা পোষণের প্রশিক্ষণ দাও এবং আলীর নির্দেশনা অনুযায়ী তাদেরকে গড়ে তোল।[৩]

হযরত আবু যুবাইর বলেন, 'আমি জাবিরকে জিজ্ঞেস করলাম, আলী কেমন ব্যক্তি ছিলেন?' জারিব তাঁর ভ্রু উত্তোলন করলেন এবং বললেন : 'আলী ছিলেন পৃথিবীর ওপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যখন মহানবী (সা.) জীবিত ছিলেন তখন আমরা আলীর প্রতি ঘৃণা পোষণকারীকে দেখে মুনাফিকদেরকে চিনতাম।' [৪]

কেউ কেউ জাবিরকে জিজ্ঞেস করত যে, আলীর বিরোধিতা করা কেন অবৈধ (হারাম)? তিনি জবাব দিতেন : 'কাফির ও অবিশ্বাসীরা ছাড়া সবাই আলীর বিপক্ষে যুদ্ধ করার অবৈধতা সম্পর্কে জানত।' এই বিষয়কে নির্দেশ করে হযরত জাবির থেকে আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

---

১. ইখতিয়ার মারিফাতুর রিযাল, পৃ. ৪৩, তানকিহুল মাকাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯
২. আ'য়ানুশ শিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯, উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭
৩. ইখতিয়ার মারিফাতুর রিযাল, পৃ. ৪৪
৪. মুখতাসার, তারিখে দামিশক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২

'উলুল আম্‌র' (ইসলামি সমাজে যাঁরা কর্তৃপক্ষ বা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন) সম্পর্কে হযরত জাবির

প্রচুর সংখ্যক মানুষ 'উলুল্ আম্‌র' এর অর্থের ব্যাপারে ভুলে নিপতিত হয়েছে। এজন্য তারা বিশ্বাস করে যে, উলুল আমরের অন্যতম হলো যে কোন সরকারের প্রধান, এমনকি যদি সে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীও হয়। এমনকি কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এও বলেছে যে, এই ধরনের শাসকের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক (ফরয)।

এইভাবে তারা স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসকদেরকে শক্তিশালী করেছে এবং এর ফলে মুসলমানদের জন্য অনেক সমস্যা তৈরি করেছে। শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক শাসকই উলুল আম্‌র নয়। এর বিপরীতে উলুল আম্‌র হলেন বারো জন যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঠিক উত্তরাধিকারী এবং মহানবী (সা.) কর্তৃক তাঁদের নাম ও পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁদেরকে অনুসরণ ও মান্য করাকে মহান আল্লাহ ও মহানবী (সা.)-কে মান্য করার সাথে তুলনা ও সদৃশ করা হয়েছে।

হযরত জাবির মহানবী (সা.) থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেটা এই বিষয়কে পরিষ্কার করে এবং উলুল আম্‌র সম্পর্কে সবকিছুকে স্পষ্ট করে দেয়। যখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার উলুল আম্‌রের...

তখন জাবির বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম : 'আমরা আল্লাহ ও রাসূলকে চিনি আর তাই তাঁদেরকে অনুসরণ করি, কিন্তু আমরা জানি না যে, উলুল আম্‌র কারা যাঁদেরকে অনুসরণ করাকে আল্লাহ একই রকম আদেশে বা তাঁকে এবং আপনাকে মান্য করাকে একই মর্যাদায় উল্লেখ করেছেন?' মহানবী (সা.) বললেন : 'উলুল আম্‌র হলো আমার উত্তরাধিকারী ও আমার পর নেতা (ইমাম)। তাদের প্রথম হলো আলী ইবনে আবি তালিব এবং তারপর হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী, আলী ইবনুল হুসাইন এবং মুহাম্মাদ ইবনে আলী– যে তাওরাতে 'বাকির' নামে পরিচিত। হে জাবির! তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমার নিজের চোখে

তাকে দেখবে। যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে আমার সালাম দেবে। তারপর হলো জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, তার পরে মূসা ইবনে জাফর, তার পর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, তার পর আলী ইবনে মুহাম্মাদ, এরপর হাসান ইবনে আলী, তার পর তার সন্তান যার নাম ও কুনিয়া আমার নাম ও কুনিয়ার মতো। পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম তার দ্বারা বিজিত হবে। সে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করবে এবং একটি দীর্ঘ অন্তর্ধানে থাকবে। এটা এ কারণে যে, দুর্বল ঈমানের অধিকারী কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তার ইমামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে, তারা ব্যতীত যাদের অন্তর আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বাস দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন।"[১]

শিয়াদের ইমামগণের নাম উল্লেখ করে হযরত জাবির থেকে প্রচুর সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যাঁরা সত্যিকার উলুল আম্‌র এবং সেই হাদিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো 'হাদিসে লওহ'। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আরো অনেক দলিল রয়েছে।[২]

জাবির– মুয়াবিয়ার উপহার প্রত্যাখ্যানকারী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী পরিবারের প্রতি জাবির ভীষণভাবে অনুরক্ত ছিলেন। এই ভালোবাসা ও অনুরক্তির কারণে তিনি কখনই নবী পরিবারের শত্রু ও বিরোধীদের সাথে আপোষ করেন নি।

একবার হযরত জাবির একটি কার্যোপলক্ষে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে মুয়াবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। মুয়াবিয়া, যিনি নবীপরিবারের প্রতি জাবিরের ভালোবাসা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তিনি তাঁকে অপমান করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এই সাক্ষাৎ প্রদানকে কয়েকদিন বিলম্বিত করেন। পরিশেষে যখন জাবির সিরিয়াতে তাঁর প্রাসাদে সাক্ষাতে মিলিত হন তখন তিনি মুয়াবিয়াকে বলেন : 'তুমি কি মহানবী (সা.)-কে বলতে শোন নি– প্রয়োজন ও দুশ্চিন্তার দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ সেসব শাসকের ওপর থেকে ক্ষমা তুলে নেবেন যারা অভাবী ও বিপর্যস্ত লোকদেরকে তাদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয় না যাতে তারা তার কাছে তাদের সমস্যাদি তুলে ধরতে পারে এবং যে কোন শাসককে আল্লাহ তাঁর ক্ষমা থেকে দূরে

১. তাফসীরে শাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬, কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন নিয়ামাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫
২. উয়ুন আখবারির রিযা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০, বিহার, ৩৬তম খণ্ড, পৃ. ১৯৩, কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন নিয়ামাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩

সরিয়ে দেবেন যে অভাবীদের দুর্ভোগ মোচন করে না।' মুয়াবিয়া একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন : 'আমি আল্লাহর নবীর কাছ থেকে শুনেছি যে, তাঁর পরে (মানুষ) অত্যাচারী শাসক ও সরকারের মুখোমুখি হবে, (তখন) তাদের কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা ও শাসকদের অনুগত থাকা।'

জাবির বললেন : 'তুমি সত্য বলেছ এবং আমাকে সত্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ– যা আমি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম।' একথা বলার পর তিনি মুয়াবিয়ার প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। তিনি তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং সিরিয়া থেকে বের হয়ে গেলেন। মুয়াবিয়া পরে তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। ভুলের মাশুল হিসেবে তিনি হযরত জাবিরের কাছে উপহার হিসেবে ছয়শ' দীনার প্রেরণ করলেন, যা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি উপহারের বাহককে বলেন : "মুয়াবিয়াকে বল, 'হে কলিজাভক্ষণকারিণীর পুত্র! আমি কখনই তোমার জন্য কোন ভালো কাজের উসিলা হব না।"[১]

(চলবে)

সংকলন ও অনুবাদ : মিকদাদ আহমেদ

('জাভা'নানে নামুনেয়ে সাদরে ইসলাম' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

১. কামুস আর রিযাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭